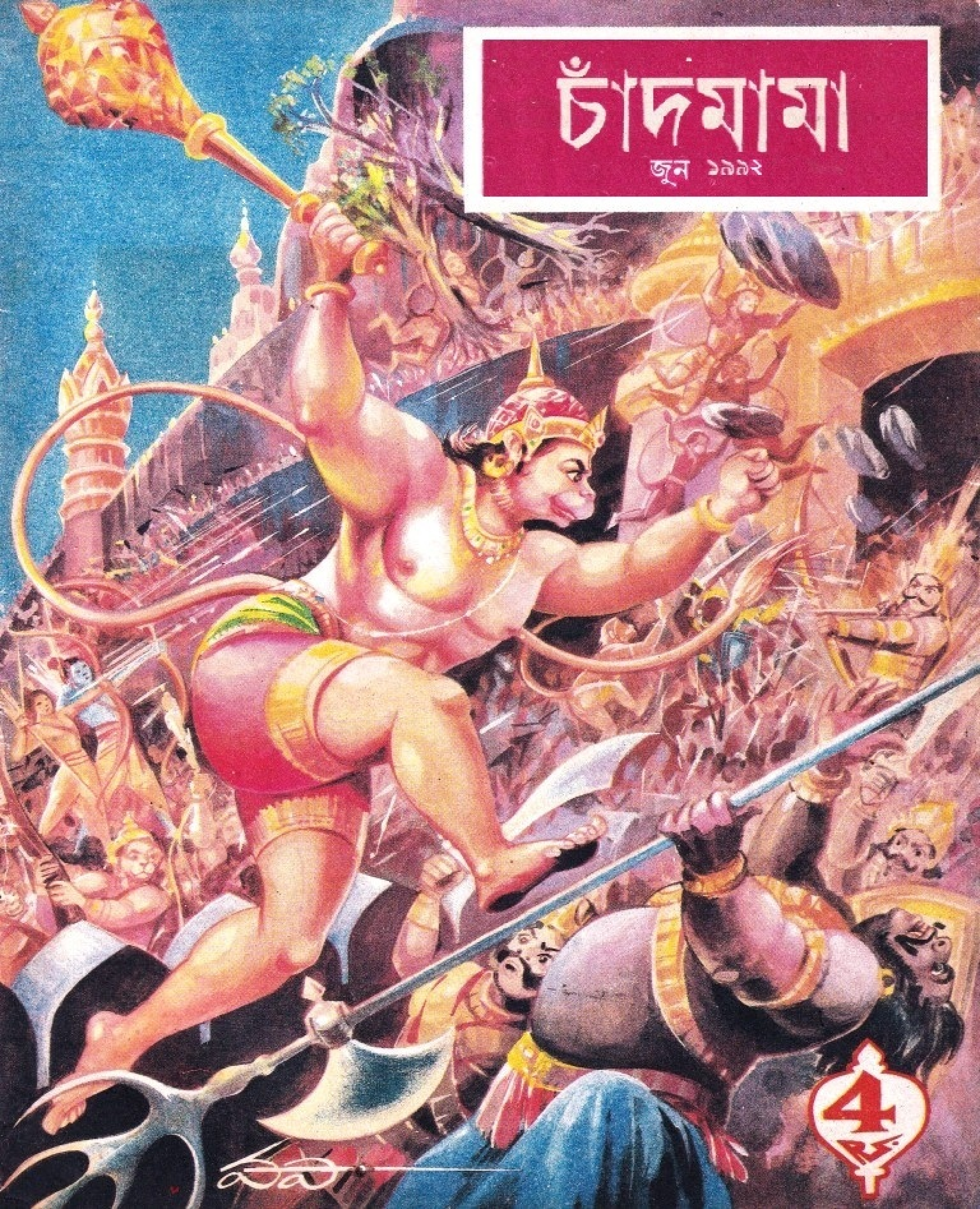
চাঁদমামা

জুন ১৯৯২



ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় কমিকস্ 'ডায়মন্ড কমিকস্'
প্রতি মাসে প্রকাশ করছে চাচা চৌধুরী, বিল্লু, পিংকী
আর ফ্যান্টমের নিত্যনতুন এবং
আকর্ষনীয় কান্ডকারখানা।



কার্টুনিস্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধুরী একজ ন বুদ্ধিমান মানুষ। উনি ওনার কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর বুদ্ধির জোরে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। জুপিটারবাসী অসীম শক্তিমান সাবু ওনার সাহায্যকারী। শক্তি আর বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে—এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।



চঞ্চল, দুষ্টু পিংকী কার্টুনিস্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি। পিংকী, ওর দাদু আর ওদের প্রতিবেশী ঝপটজীর অদ্ভূত-অদ্ভূত কান্ডকারখানা তোমাদের তো আনন্দ দেবেই, অত্যন্ত গোমড়ামুখোদেরও হাসতে বাধ্য করবে।

কার্টুনিস্ট প্রাণের আরেকটি চঞ্চল চরিত্র বিল্লু তার সঙ্গীসাথী গাব্বু, জোজি আর বজরঙ্গী পালোয়ান-কে নিয়ে তোমাদের মনোরঞ্জনের জন্য ইতিমধ্যেই বুকস্টলে হাজির হয়ে গেছে। আট থেকে আশী বছরের বাচ্চারাও সমানভাবে আনন্দ পাবে বিল্লুর মজার-মজার কান্ডকারখানা পড়ে।





সমগ্র বিশ্বে ১৫০ টিরও বেশী দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো সবার কাছে সমান মনোরঞ্জনের পাত্র। প্রাচীন কাল থেকে বংশানুক্রমে অসহায়ের বন্ধু ও অপরাধীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূতের সৃষ্টিকর্তা শ্রী লী ফক, যিনি জনপ্রিয় ম্যান্ডেক-এরও সৃষ্টি করেছিলেন।

ডায়মন্ড পকেট বুকস্-এর নিবেদন



ডায়মন্ড পকেট বুকস্-এর সগর্ব প্রকাশন—'ডায়মন্ড ইংলিশ স্পীকিং কোর্স'—যা আপনাকে ইংরাজী ঠিকমত বলতে না পারার হীনমন্যতার হাত থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে। নিজের কাজ, ব্যবসায় ও বন্ধুদের সঙ্গে শুদ্ধভাবে ইংরাজীতে কথা বলে নিজের মান ও প্রতিষ্ঠা বাড়ান।

ডায়মন্ড পকেট বুকস্-এর আরেকটি সগর্ব প্রকাশন—'ডায়মন্ড বেঙ্গলী লার্নিং এ্যান্ড স্পীকিং কোর্স থ্রু ইংলিশ'—এই বইটি আপনাকে ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে অন্যতম এবং সম্ভবত সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা 'বাংলা ভাষা' শিখতে সাহায্য করবে।



DIAMOND COMICS PVT. LTD.
2715. DARYA GANJ. NEW DELHI-2.

DISTRIBUTORS : **VISHAL BOOK CENTRE** 4, TOOTI LANE, CALCUTTA-16


YOU KNOW HOW THESE GROWN-UPS KEEP TELLING US "DON'T DO THIS" AND "DON'T DO THAT"?
SO HERE'S SOMETHING GROWN-UPS ARE NOT ALLOWED TO DO (HA! HA! HA!)
THEY'RE NOT ALLOWED TO EAT THIS YUMMY NEW JAM FROM VOLFARM
BECAUSE (MMM!) IT S FAR TOO GOOD FOR THEM
STRICTLY FOR KIDS ONLY!
New Volfarm Jam is made just for kids.
So, naturally, it's made just the way kids like it.
With the yummiest, juiciest fruits. (Slurp, slurp!)
Tell all those adults to keep their hands off it!
NOW
Volfarm
MIXED FRUIT
PINEAPPLE
JAMS
Ogilvy & Mather 9661



কাঁচা
মনের
কচি রঙ
মজাই মজা ইস্কুলে
আমোদ নূতন-নূতন,
নূতন ফেভিক্রীল
স্টুডেন্ট্‌স পোষ্টার কালার
একদম মনের মতন !
মৃদু এবং মোলায়েম
রঙ-বেরঙা ব্রাইট্,
টিয়া-সবুজ, টুকটুকে লাল
সেরা নীল
আর স্নো-হোয়াইট !!
মেরে দাও কেল্লা ড্রইংএর পাল্লায়,
চটপট্ কালার ভরো,
নূতন ফেভিক্রীল স্টুডেন্ট্‌স
পোষ্টার কালারে
তুমুল মজা করো !
(উঁহু ! মার বকুনির ভয় নেই, এর দাম মাকে খুশী করবেই, তোমার ড্রইং দেখে সাবাস্ বলবেই !)
বিনামূল্যে
পেইন্ট-এ-পোষ্টার
লিখে দাও এই ঠিকানায় : ফেভিক্রীল, পোষ্ট বক্স 17437 আন্ধেরী (পূর্ব), বম্বে-৪০০ ০৫৯
বিনামূল্যে
স্টেনসিল - প্রত্যেক লিলিপুট কিট-এর সঙ্গে
STUDENTS' POSTER COL
Fevicry
নতুন
পিডিলাইট
ফেভিক্রীল®
স্টুডেন্ট্‌স
পোষ্টার কালার্স
ফেভিকল ব্র্যাণ্ড অ্যাডহীসিভ্‌স্‌এর নির্মাতা পিডিলাইট এর তরফ থেকে
everest/91/PIL/117 bn
আজ্ঞে হাঁ, অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠান একটি
বিনামূল্যে
ফেভিক্রীল পেইন্ট-এ-পোষ্টার
নাম :
বয়স :
ঠিকানা :
স্কুল :
CDM

গৌতম গোস্বামী
৪-৬-১৯৯২

চাঁদমামা

জুন ১৯৯২

এই সংখ্যায় আছে

বিশ্বের বাতায়নে ... ৯
মোক্ষলাভ ... ১১
জাদু-প্রাসাদ ... ১৭
মাতৃদক্ষিণা—গুরুদক্ষিণা ... ২৫
তিনটি প্রশ্ন ... ৩২
চাঁদমামার ক্রোড়পত্র ... ৩৩
রবিনের শিক্ষা ... ৩৭
যোগ্যতার পরীক্ষা ... ৪১
হনুমানের কথা ... ৪৫
বিচার চাই ... ৫৩
বন্ধ কর ... ৫৭
যাচাই করা ... ৬০

গাঁও - পাটাছাৰকুচি (পাটাসত্ৰ)
জিলা - বৰপেটা (অসম)
পিন - ৭৮১৩২৬

চাঁদমামা

নিয়ন্ত্রক: বি. নাগি রেড্ডি সংস্থাপক: চক্রপাণি

পৃথিবীর অস্তিত্ব-সঙ্কট

আগামী জুন মাসে রিও-ডি-জেনিরোতে পৃথিবী রক্ষাকল্পে যে শীর্ষ সম্মেলন হবে, তার দিকে সবাই সাগ্রহ দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করছে। পৃথিবীকে বিনষ্টির হাত হতে কি করে রক্ষা করা যায়, তাই হবে সম্মেলনের আলোচ্য। সারা জগতের বিভিন্ন প্রান্ত হতে দেশপ্রধানেরা এখানে সমবেত হবেন।

ইদানীং আমরা টিভিতে বা রেডিওতে এই কথাগুলো মাঝেমধ্যেই শুনছি "গ্লোব্যাল ওয়র্মিং", "গ্রীনহাউস গ্যাস", "ওজোন হোল", "ক্লাইমেট চেঞ্জ"। যদিও কথাগুলোর শব্দার্থ সব আলাদা আলাদা কিন্তু সঙ্কেতার্থ সব একই—মাতা ধরিত্রী মহাবিনষ্টির পথে। বর্তমানে যদি সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় এবং ভবিষ্যতেও যদি দীর্ঘকালীন কোন প্রতিরোধমূলক উপায় গ্রহণ না করা হয়, পৃথিবী অবশ্যই ধ্বংস হবে। শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইড যে পরিমাণে নির্গত হয় তাই সমস্ত প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ-কে নির্মূল করার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রকৃতির ভারসাম্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়। গত কয়েক দশকে যথেচ্ছভাবে বনভূমি উচ্ছেদ করা হয়েছে। গাছপালা কেটে ফেলা হয়, অথচ তার জায়গায় নতুন কিছু লাগানো হয় না। আজকাল বলা হচ্ছে—একটা গাছ কাটতে হলে দুটো চারা গাছ রোপণ করা উচিত।

নিশ্চয়ই এটা খুব কঠিন কাজ নয়। যদি লোকেরা তাদের আত্মীয় প্রিয়জনদের স্মৃতি হিসাবে গাছ লাগাতে শুরু করে, তবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটার সঙ্গে সঙ্গে একটা হৃদয়ের যোগও ঘটে যায়। উত্তর প্রদেশ সরকার এইরকম একটা মনোভাব নিয়ে "স্মৃতিবন" সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছেন। এটা একটা নতুন ধরনের চিন্তা—লোকেদের মনোযোগ আকর্ষণের অপেক্ষা রাখে।

খণ্ড ২০ জুন '৯২ সংখ্যা ১২

প্রতি সংখ্যা ৪·০০ বাৎসরিক চাঁদা ৪৮·০০



সালভাদরে শান্তি ফিরল



গৃহযুদ্ধের অবসানে কোন দেশে যখন শান্তি ফিরে আসে, তার চেয়ে বেশি আনন্দ-দায়ক দেশবাসীর কাছে আর কি হতে পারে?

মধ্য আমেরিকার একটি গণতান্ত্রিক দেশ, এল্ সালভাদর-এ ঠিক এই ঘটনাই ঘটল। সেখানে সামরিক কর্তৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে বামপন্থী গেরিলা বাহিনীর যুদ্ধ চলে আসছিল গত বার বৎসর ধরে এবং তারই ফলস্বরূপ প্রায় ৭৫,০০০ জনেরও বেশি মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বে স্পেনবাসীরা এল্ সালভাদরে এসে স্থানীয় আজটেক্ জনগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে ক্রমে শাসনকর্তৃত্ব দখল করে ক্ষমতা ভোগ করে ১৯ শতকের গোড়ার দশকগুলি পর্যন্ত। স্পেনের কর্তৃত্বকে খর্ব করে দিয়ে ১৮২৩ সালে গঠিত হয় সেন্ট্রাল আমেরিকান ফেডারেশন নামে একটি রাষ্ট্রগোষ্ঠী; এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত অন্য দেশগুলি হল—, গুয়াতেমালা, হণ্ডুরাস, নিকারাগুয়া এবং কোস্টারিকা। কিন্তু এই যুক্তরাজ্য মাত্র পনের বৎসর টিকে ছিল, তারপরেই আসে ভাঙন। ১৮৩৮ সালে এল্ সালভাদর একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। কৃষিপ্রধান দেশ এল্ সালভাদরের বৃহত্তম জনসংখ্যার প্রধান উপজীবিকা চাষবাস হলেও এর অধিকাংশ কৃষিযোগ্য জমির মালিকানা ছিল ধনী ও বিত্তশালী পরিবারগুলির দখলে।

স্বাধীনতালাভের পরে একশ বছর ধরে এল্ সালভাদরে চলেছে নানা অশান্তি, বিশৃঙ্খলা। বহু সালভাদরবাসীকে প্রতিবেশি রাষ্ট্র হণ্ডুরাসে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে। ফলে এই দুই দেশের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তিক্ততা, শত্রুসম্পর্ক, এবং ১৯৭০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলে সালভাদরের নিকট হণ্ডুরাস ফুটবল দলের পরাজয় ডেকে নিয়ে আসে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের ভয়াবহতা!

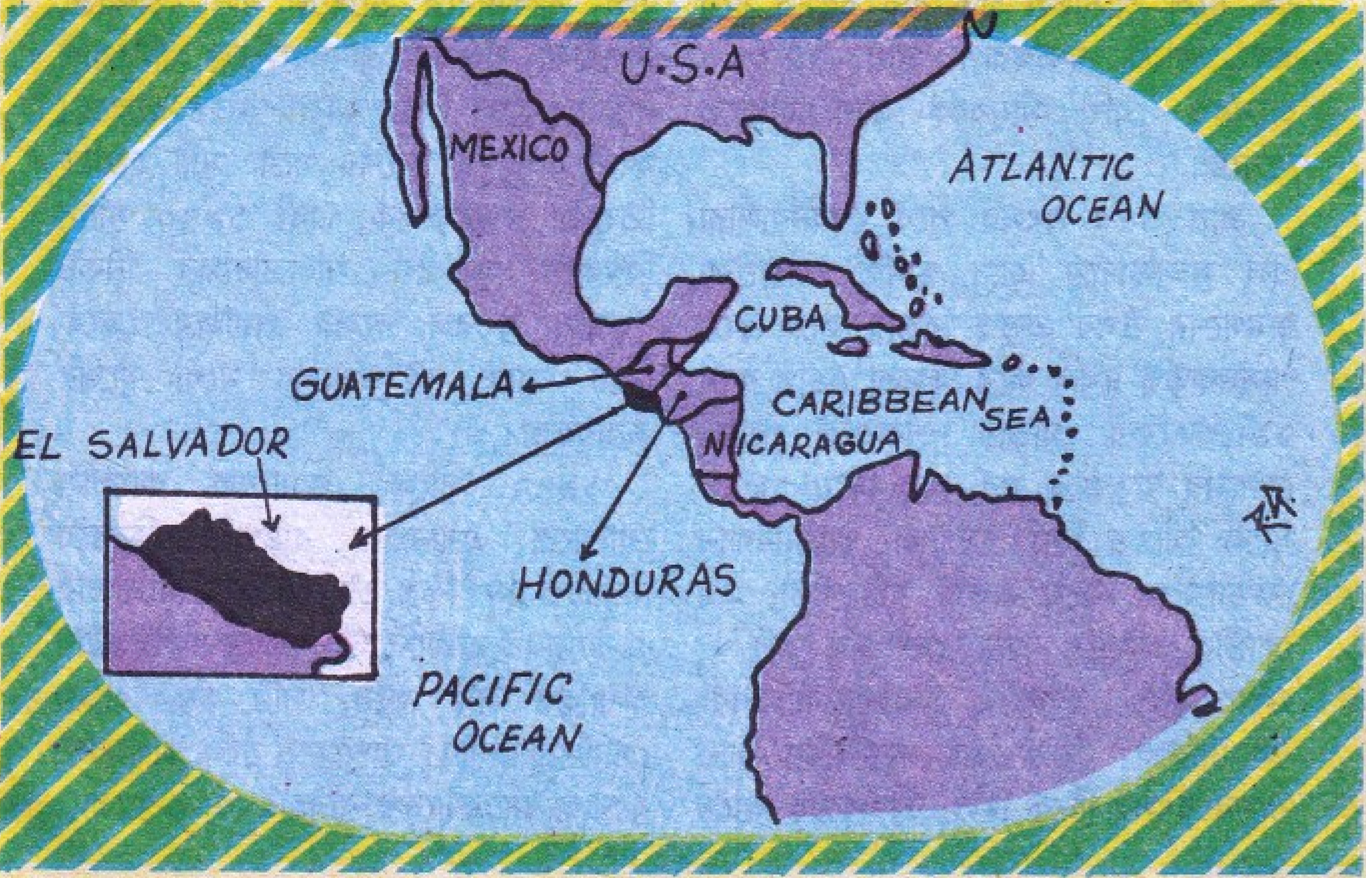
১৯৭২ সালে জেনারেল কার্লোস রোমেরো এখানকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। কিন্তু তাঁর অনমনীয় মনোভাব ও কঠোর দমননীতি ভীষণভাবে আভ্যন্তরীণ অশান্তির সৃষ্টি করে, সৃষ্টি হয় বিভিন্ন গেরিলাবাহিনীর। দেশজুড়ে চলে অপহরণ, যথেচ্ছ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ও গুপ্তহত্যা।

১৯৮০-তে রাজধানী সান সালভাদরের জনপ্রিয় খ্রীষ্টান ধর্মাধ্যক্ষ অস্কার রোমেরো-কেও প্রাণ হারাতে হয় এর জন্য। সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায়। তখনই গৃহযুদ্ধের শুরু।

সে-বছরেই হোসে দুয়ার্তে নতুন রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনিও অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হলেন। এই সময়ে তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হওয়ায় হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাত্রা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেল। ১৯৮৯ সালে নতুন রাষ্ট্রপতি-রূপে নির্বাচিত হন অ্যালফ্রেডো ক্রিস্টিয়ানী। নির্বাচিত হওয়ার পরেই তিনি দেশে শান্তি-স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহায্যে দুই বৎসর পর তার সম্ভাবনা দেখা যায়।

এই বছরের ১৬ জানুয়ারী যে শান্তি-চুক্তির ভিত্তিস্থাপনা হয়, ১লা ফেব্রুয়ারী হতে তা কার্যকরী হয়। চুক্তিস্বাক্ষরের পূর্ব-মুহূর্তে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্পাদক ড.ঘালির মন্তব্য, "এল্ সালভাদরের দীর্ঘরাত্রির অবসান হতে চলেছে।"

স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে গেরিলাবাহিনীর অবলুপ্তি ঘটান, বিশাল সেনাবাহিনীর আয়তন কমানো, ভূমি-সংস্কার, বিচার বিভাগ ও নির্বাচন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করা। পলাতক দেশত্যাগী বিদ্রোহীরা মেক্সিকো হতে দেশে ফিরে এলে তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানান হয়। সরকারী নেতারাও তাদের সম্বোধন করে বলে, "আমাদের দেশবাসীগণ"।





মোক্ষলাভ

অনেকদিনের কথা। নির্বাস নামে এক মুনি, গভীর জঙ্গলে তাঁর ধ্যান-তপস্যা নিয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাগী। সামান্য কারণেই কোন কিছু না ভেবে অভিশাপ দিতেন। এ-কারণে লোকেরা ভয়ে তাঁর থেকে দূরে থাকত।

একদিন ওই রাজ্যের রাজা সন্দীপকুমার শিকারে এসেছেন। শিকার শেষে নির্বাস-মুনিকে দর্শন করতে আসেন। কিন্তু হায়, কি কারণে মুনি ক্ষিপ্ত হয়ে রাজাকে অভিশাপ দিলেন, "রাক্ষস হয়ে তুমি বনে জঙ্গলে ঘুরবে।" আর কি, রাজা সন্দীপকুমার রাক্ষস হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান আর সকলকে বিরক্ত করেন।

শিকারে এসে রাজা নিখোঁজ! মন্ত্রী সুকান্ত রাজার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। বহু চেষ্টার পর জানতে পারলেন প্রকৃত কারণ। ছুটে এসে লুটিয়ে পড়লেন নির্বাসমুনির চরণে। প্রার্থনা জানালেন, "মহাত্মা, রাজা সন্দীপ অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও প্রজাবৎসল, তবুও কেন তাঁর এই পরিণতি? যে রাজা তাঁর সুশাসনের ফলে প্রজাদের মধ্যে শান্তি ও আনন্দ বজায় রেখেছেন দীর্ঘকাল যাবৎ, তিনিই আজ তাঁর প্রজাদের কাছে অশান্তি ও ভীতির কারণ হয়ে উঠেছেন। আপনি যদি কৃপা করে তাঁর শাপমুক্তির উপায় বলে দেন।"

সুকান্তর বিনয় ও আন্তরিকতা দেখে তাঁকে অত্যন্ত ভালবেসে ফেললেন মুনি। করুণার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বৎস, কোন ঘটনাই তাঁর ইচ্ছা বিনা ঘটে না। রাজার এই পরিণতি এবং সেই কারণে প্রজাদের ভীতি, এও হয়তো তাঁরই ইচ্ছা। আমার অভিশাপ নিমিত্তমাত্র। তিনিই আমাদের সব চালনা করেন।"

"মহাত্মা, এ-সকল সবই সত্য, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা বৃথা হবার নয়। তাহলে বলতে হবে, আমার আসাটাও তাঁরই ইচ্ছায়



ঘটেছে। রাজার অভিশাপমুক্তির সময় হয়ে এসেছে, প্রজাদেরও কর্মফলের সমাপ্তি হতে চলেছে। আপনি কৃপা করুন, এর অবসানের জন্য কোন একটা পথ বলে দিন। এটাও সর্বশক্তিমানেরই অভিপ্রায়।" মন্ত্রী সুকান্ত প্রার্থনা জানালেন।

নির্বাসমুনি কিছু সময় নীরব থেকে পরে বললেন, "তোমার প্রতি আমার একটা আকর্ষণ জন্মে উঠেছে। এই ক্ষণকালের মধ্যেই। হয়তো, এটা তাঁরই অভিপ্রায়। তোমাকে এই অভিশাপমোচনের উপায় বলছি, শোন। এখান থেকে এক যোজন দূরে এক কালীমন্দির আছে। মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবীমূর্তি অত্যন্ত জাগ্রত; অত্যন্ত ভয়ঙ্করী সেই মূর্তি। দেবীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তোমার দেহের সর্বাপেক্ষা প্রিয় অঙ্গটি তাঁকে যদি অর্পণ কর তবেই তোমার প্রার্থনা পূরণ হবে।"

মন্ত্রী সুকান্ত কৃতজ্ঞতায় মুনিকে প্রণাম জানিয়ে সোজা এলেন সেই কালীমন্দিরে। মন্দির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তি সত্যি ভয়ঙ্কর। সুকান্ত মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানালেন, "মা, আমায় তুমি করুণা কর মা। এই দেশের রাজা সন্দীপকে তুমি মানবরূপ ফিরিয়ে দাও। এর বিনিময়ে আমি আমার দেহের সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমার এই মস্তকটি তোমার চরণে সমর্পণ করছি।" এই বলে সুকান্ত তরবারির সাহায্যে নিজের মস্তকটি কাটতে প্রস্তুত হলেন।

ঠিক তখনই সেখানে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল এক তীব্র আলো, দিব্যজ্যোতির প্রকাশ। সুকান্ত সেই আলোর তীব্রতা সহ্য করতে পারলেন না। চোখদুটি বন্ধ করে ফেললেন। তার মধ্যেই শুনতে পেলেন, "তোমার দেশভক্তি ও সাহস দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তোমাকে আর মুণ্ডচ্ছেদ করতে হবে না। তোমার প্রার্থনা পূরণ হবে। কিন্তু তার পূর্বে তোমাকে একটি শর্ত মানতে হবে। একটি কার্য সম্পূর্ণ করতে হবে। শীঘ্রই রাজধানীতে ফিরে যাও। সকলের বোধযোগ্য করে হাজার পৃষ্ঠার একটি কাহিনী তোমাকে লিখতে হবে। কাহিনী সমাপ্ত করে সেই কাহিনীই তুমি রাক্ষসরূপী রাজা সন্দীপকে শোনাবে। মনে রাখবে, একবার পাঠ শুরু করলে তা সমাপ্ত না করে কখনই থামা যাবে না। তার ইচ্ছাও যেন না হয়। তাহলেই রাজা সন্দীপ তার পূর্বরূপ এবং শক্তি ফিরে পাবে।"

সুকান্ত তখনও চোখ বন্ধ করে রয়েছেন। নির্ঘোষিত বাণী শুনে তিনি চমকে উঠে বললেন, "মা, এ কি করে সম্ভব! আমি রাজনীতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছি, প্রজাদের ও রাজকার্যের উপযোগী বহু গ্রন্থ ও শাস্ত্র আমি অধ্যয়ন করেছি, বৈদ্যশাস্ত্র সম্বন্ধেও পড়াশুনা করেছি। কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই মা, একটি কাব্যও আমি পড়িনি। কেউ পড়ে শোনাতে চাইলেও সে সুযোগ আমি দিইনি। এত অজ্ঞ হয়ে আমি কিভাবে কাহিনী লিখব?"

"তুমি যা অধ্যয়ন করেছ, তাতেই যথেষ্ট। এর জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা তোমার আছে। যা জান তাও কি তুমি সুন্দরভাবে লিখতে পারবে না? যাও, তুমি যা-ই লিখবে তাতেই সকলে খুশি হবে, আনন্দ পাবে; তোমার লিখিত কাহিনী শুনে মানুষের শাপমোচন হবে, মঙ্গল হবে। আমার আশীর্বাদ রইল।" এই কথাগুলি শেষ হবার পরই ধীরে ধীরে আলো মিলিয়ে গেল। সুকান্ত চোখ খুলে দেখেন, আগের মত কালীমূর্তি সেখানেই রয়েছে।

দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে সুকান্ত রাজধানীতে ফিরে এলেন। দিনরাত্রি পরিশ্রম করে সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে হাজার পৃষ্ঠার একটি কাহিনী লিখলেন। কাহিনী-রচনা সমাপ্ত করেই বেরিয়ে পড়লেন রাজা সন্দীপের সন্ধানে। সন্ধান করতে করতে একসময় দেখা পেলেন তাঁর। রাক্ষসরূপী সন্দীপ দূর থেকে সুকান্তকে দেখেই তাকে মারবার জন্য তেড়ে আসে। কাছে আসামাত্র সুকান্ত দেবীর স্মরণ নিয়ে তাঁর কাহিনীপাঠ শুরু করলেন। কাহিনীর শব্দগুলি কানে যাওয়ামাত্র রাক্ষস





স্থির হয়ে গেল। মন্ত্রের মত কাজ করল শব্দ-উচ্চারণ।

সুকান্ত একের পর এক পাতা উলটিয়ে পড়ে যাচ্ছেন, আর রাক্ষসরূপী রাজা সন্দীপ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে তা শুনতে থাকে। সুকান্ত কোনভাবেই সামান্য সময়ের জন্যও বিরত না থেকে স্বরচিত কাহিনী পাঠ শেষ করলেন। রাক্ষস তা শুনল। যেইমাত্র শেষ পৃষ্ঠাটি সমাপ্ত হল, ঠিক তখনই রাক্ষসের জায়গায় দেখা গেল রাজা সন্দীপ দাঁড়িয়ে। একই রূপ, ঔজ্জ্বল্য, সুন্দর দেহ-স্বাস্থ্য। মুখে সেই অতিপরিচিত সুন্দর হাসি।

রাজাকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী ফিরে এলেন রাজধানীতে। রাজধানীতে কি উল্লাস, রাজার সন্ধান পাওয়া গেছে, ফিরে এসেছেন রাজধানীতে। রাজা সন্দীপ প্রজাদের মধ্যে এত উল্লাস দেখে মন্ত্রীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না, শুধু বললেন, "তোমার রচিত কাহিনীটি বড়ই সুন্দর। এরকম আরো আরো লিখে তুমি আমায় প্রসন্ন কর।"

রাজার অনুরোধের উত্তরে মন্ত্রী বললেন, "প্রভু, গ্রন্থ রচনা আমার সাধ্যের বাইরে। আপনার জন্যই দেবীর কৃপাতে এটি রচনা করা সম্ভব হয়েছে। পূর্বের মত আপনার মন্ত্রণাদাতা হিসাবেই আমি থাকতে চাই। এরকম কাহিনী আপনি কোন সাহিত্যিককে দিয়ে লিখিয়ে নিন মহারাজ। রাজকার্যে আপনাকে সহায়তা দান করার জন্যই আমার সমস্ত সময় ব্যয় হোক, তাই আমি চাই।"

সুতরাং দরবারের পণ্ডিত ও কবিদের উপরে রাজা দায়িত্ব দিলেন ওরকম কাব্য রচনার জন্য। কিন্তু সুকান্ত-লিখিত কাব্য পাঠ করে তারা একবাক্যে রাজার কাছে স্বীকার করল, এই কাব্য এত উঁচুস্তরের যে তাদের পক্ষে এরকম দ্বিতীয়টি লেখা অসম্ভব। একমাত্র সরস্বতীর বরপুত্র যাঁরা, তাঁদের পক্ষেই সম্ভব।

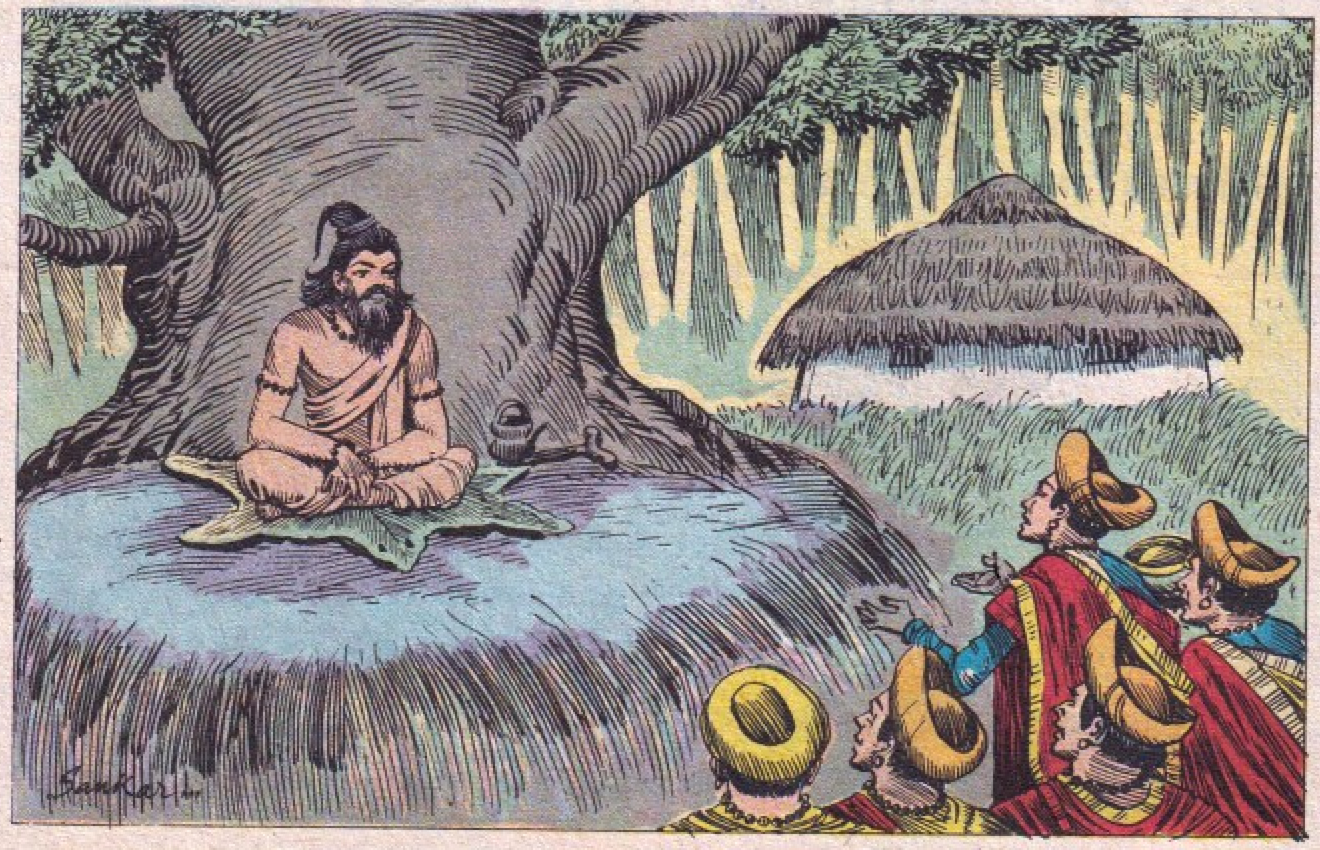
রাজা সন্দীপ দরবারের কবি-পণ্ডিতদের অক্ষমতার কথা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু প্রকাশ করলেন না। রাজ্যে ঘোষণা করে দিলেন, এরকম কাব্যগ্রন্থ যে লিখতে পারবে তাকে দশহাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই সঙ্গে মন্ত্রী সুকান্ত-রচিত গ্রন্থের বহু কপি করে তা জনগণের মাঝে বিলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন, যাতে প্রত্যেকেই ওই কাব্যগ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ পায় এবং সেরকম লেখার জন্য অনুপ্রেরণা পায়।

পুরস্কারের লোভে কোন সাহিত্যপ্রেমীই এগিয়ে আসতে সাহস পেল না। বরং কিছু নিম্নস্তরের লেখক অতি সহজে কিস্তি মাত করার জন্য কিছু কিছু লেখা লিখল। তা পাঠ করে লোকেদের মনোরঞ্জন হতে লাগল কেবল। রাজার কাছে কিছু কিছু পুরস্কার মিলল, অন্য কোন লাভ হল না।

এভাবে বেশ কিছু সময় কেটে গেল। দ্বিতীয় কোন কাব্যসৃষ্টি না হওয়ার ফলে রাজ্যময় কবি ও পণ্ডিতদের আদর-সম্মান কমল। এই আদর-সম্মান রক্ষা করাই হয়ে উঠল তাদের সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের উপায় সন্ধান করাই প্রধান ও প্রথম কাজ। কিন্তু কি ভাবে? বহু আলোচনা করেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে তারা নির্ণয় করলে যে, এর সমাধান একমাত্র মহামুনি নির্বাসই করতে পারবেন। সুতরাং তাঁর কাছে যাওয়াই স্থির হল।

কিন্তু প্রশ্ন। নির্বাসমুনি অত্যন্ত রাগী। তাঁকে গিয়ে বিরক্ত করার ফলে তিনি যদি অভিশাপ দেন, তাহলে? অনেকেরই এই ভয়, এই সন্দেহ। এর উত্তরে অন্যজনেরা বলল, কাব্য লিখতে না পেরে যে অসম্মান হচ্ছে, মূর্খেরাও আজেবাজে লিখে তাদের মর্যাদা যেভাবে ক্ষুণ্ণ করছে, তার তুলনায় মহামুনির ক্রোধে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া অনেক ভাল।

মন্ত্রী সুকান্ত-রচিত গ্রন্থ নিয়ে মহামুনি নির্বাসের কাছে দল বেঁধে কবি-পণ্ডিতেরা এল। মুনি তখন ধ্যানমগ্ন। তাদের আগমনের ফলে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল। সকলেই এই অবস্থায় ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। এখনই বোধহয় রাগে তাদের ভস্মীভূত করে দেবেন।



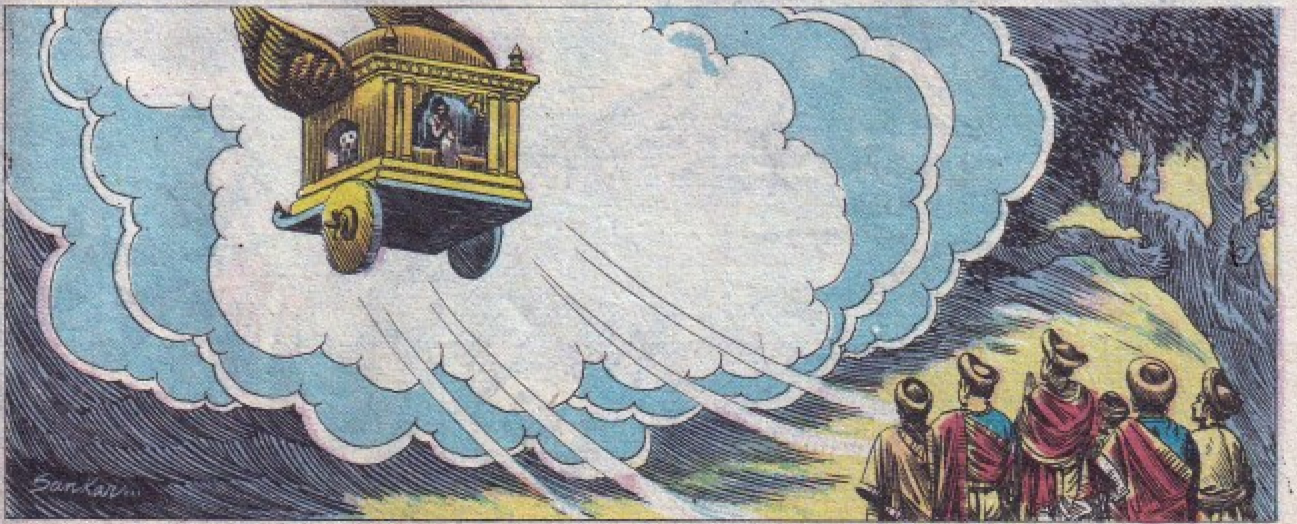
মুনি চোখ খুলে সকলকে দেখে নিলেন। তাদের দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, কেন তারা এসেছে। সুকান্তর গ্রন্থটি হাতে নিয়েই বুঝলেন তার রহস্য। তখন তিনি উপস্থিত কবি-পণ্ডিতদের অভয়দান করে বললেন, "মোক্ষলাভের জন্য আমি দীর্ঘদিন যাবৎ কঠোর তপস্যা করছি। কিন্তু আমার ক্রোধকে আমি বর্জন করতে পারিনি বলে কঠোর সাধনা করা সত্ত্বেও আমার মোক্ষলাভ হয়নি। ক্রোধের বশে আমি অভিশাপ দিই লোককে, বলি তারা তাদের কর্মফল ভোগ করছে। তারা হয়তো এর ফলে উপকৃত হয়,, কিন্তু আমার আর অগ্রগতি হয় না। ...কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করেছি, আমার যেন আর রাগ নেই, সব যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু বুঝতে পারিনি কেন? আজ এই গ্রন্থ স্পর্শ করে আমি বুঝলাম যে, এই গ্রন্থই এর কারণ।"

"এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য যদি কৃপা করে বুঝিয়ে বলেন," পণ্ডিতেরা জানতে চাইল।

"তোমরা পণ্ডিত ব্যক্তি, অতিরিক্ত বলা নিষ্প্রয়োজন। সুকান্তের এই গ্রন্থ পাঠে রাক্ষসজন্ম থেকেও উদ্ধার পাওয়া যায়। এই কারণেই রাজা সন্দীপের রাক্ষসজীবনের সমাপ্তি ঘটেছে এই গ্রন্থপাঠ শুনে। আর যে গ্রন্থ রচনার পিছনে রয়েছে দেবীর অনুপ্রেরণা ও কৃপা তার ফল এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। রাক্ষসজীবনের যদি পরিসমাপ্তি ঘটে, তবে এই গ্রন্থপাঠে আর আর কর্মফলও লুপ্ত হবে, পাপমুক্ত হবে। প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই এই গ্রন্থপাঠ প্রয়োজন। মুনি-ঋষিদের অভিশাপ দেবার প্রয়োজন আর থাকছে না মানুষের কর্মফল ভোগের জন্য।" নির্বাসমুনি বললেন।

ওই সময়েই দেখা গেল, ঊর্ধ্বাকাশ হতে এক দিব্যযান সেখানে নেমে এল অতি ধীরে, নিঃশব্দে। দিব্যযান হতে নেমে এলেন দেবদূতেরা নির্বাসমুনির কাছে। তাঁদের সঙ্গে দিব্যযানে উঠে নির্বাসমুনি বললেন, "এই গ্রন্থের কারণেই আমার কর্মফল সমাপ্ত হল। আমার অজান্তেই আমার মোক্ষলাভের বাধাস্বরূপ রাগের বিলুপ্তি ঘটেছে।"

দিব্য আকাশযান পুনরায় আকাশে উঠে ক্রমে অন্তরীক্ষে মিলিয়ে গেল।





জাদু-প্রাসাদ

১

বীরগিরির সর্বত্র উত্তেজনা। লোকেদের মধ্যে কেবলই রাজকুমারী বিদ্যাবতীর জন্মদিনের আলোচনা। এবারে কিভাবে তার জন্মদিন পালন করা হবে, এই তাদের ভাবনা। যদিও জন্মদিনের আরও তিনটি সপ্তাহ বাকী, কিন্তু এরই মধ্যে রাজধানী অতি সুন্দর সাজে সেজে উঠেছে নতুন করে। নিত্য সকালবিকাল দুবার করে রাজপথ পরিষ্কার করা হচ্ছে। দীর্ঘ রাজপথের মাঝে মাঝেই সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণের কাজও সমাপ্তপ্রায়। দুধারের বাড়ীগুলি নতুন রঙে রাঙানো হয়েছে, দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা হয়েছে কত বিচিত্র চিত্র। জন্মদিনের প্রথামত রাজকুমারী তার বান্ধবীদের সঙ্গে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা-সহকারে দেবীমন্দিরে যায়, এবং দেবীমন্দির হতে প্রাসাদে ফিরে যাবার আগে তার সেই শোভাযাত্রা রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সেই জন্যই সাজ সাজ রব চারিদিকে।

অনুষ্ঠানের দিনটি ঘনিয়ে আসছে। উৎসব-আয়োজনের সমস্তই যখন সম্পূর্ণ, তখনই বিনামেঘে বজ্রপাতের মত খবরটি হঠাৎ এসে পড়ল। সমস্ত অনুষ্ঠান উৎসব বাতিল, কারণ রাজকন্যা বিদ্যাবতী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কোন চিকিৎসাতেই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। জন্মদিনে রাজকুমারীর দেবীমন্দিরে যাওয়া বা রাজপথ-পরিক্রমার কোন সম্ভাবনা নেই। বীরগিরির জনগণ এই নিদারুণ সংবাদে হতাশায় ভেঙে পড়েছে।

রাজা বীরসেন এবং রাণী ব্রজেশ্বরীও অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন। প্রজাদের মতই তাঁদের মানসিক অবস্থা। তাঁদের

জ্যোতিষীর নিদেন



আরো দুশ্চিন্তা যে, আজ পর্যন্ত তাঁদের একমাত্র এই সন্তানটির কোনদিন এরকম অসুখ করেনি। সে ভীষণ ক্লান্ত দুর্বল বোধ করছে। শালিনী, তার পরিচারিকা তাকে সাহায্য করল যদি সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে সে পড়েই যাচ্ছিল, পরিচারিকাই তাকে ধরে পুনরায় বিছানায় শুইয়ে দেয়।

খবর পেয়েই রাণী ব্রজেশ্বরী ছুটে এসেছেন রাজকন্যার ঘরে। মেয়েকে ওরকম রুগ্ন ও ফ্যাকাশে দেখে তিনি আতঙ্কে শিউরে উঠেছেন। রাজার কাছে তখনই খবর পাঠালেন তিনি। কন্যার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছেন রাজা যে, মারাত্মক একটা কিছু হয়েছে তার। সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে দিলেন রাজবৈদ্যকে নিয়ে আসার জন্য। রাজপরিবারের চিকিৎসক রাজকন্যাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু তিনি কোন কিছুই ধরতে পারলেন না। মনে হচ্ছে, সবই স্বাভাবিক। অথচ রাজকন্যা এতই দুর্বল যে বিছানা থেকেই উঠতে পারছে না। রাজবৈদ্য রাজাকে জানালেন, এই মুহূর্তেই তিনি কোন ওষুধ দিতে প্রস্তুত নন। রাজকুমারীকে আরো দু-একটি দিন ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার পরই তিনি স্থির করবেন, কি ওষুধ দেওয়া উচিত হবে। এর মধ্যে তার জন্য চাই পুরোপুরি বিশ্রাম, এমনকি, সে যদি কিছু খেতে না চায় তবে তাকে যেন জোর করা না হয়।

সেদিন রাণী সারাটা দিন রাজকন্যা বিদ্যাবতীর সঙ্গে সঙ্গে রইলেন। সুখবর যে, রাজকন্যা সর্বক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল। সন্ধ্যাবেলা যখন রাজবৈদ্য এসে তাকে পরীক্ষা করলেন, তখনই মাত্র সে জেগে উঠেছে। কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল, তার নিজেকে খুব দুর্বল মনে হচ্ছে, আর ফলের রস ভিন্ন সে আর কিছু খাবে না।

পরের দিনটিও একইভাবে কাটল। রাজকন্যাকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে রাণী ব্রজেশ্বরী স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, কিভাবে বিদ্যাবতীর জন্মদিনটি এই অবস্থায় পালন করা যায়। রাজার মতে, কোন কিছু স্থির করার আগে রাজবৈদ্যের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া উচিত।

সেদিন রাতেই রাণীর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। স্বপ্ন যে দেখেননি সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তাহলে শোবার ঘরে

কি কেউ এসেছিল? তাও তিনি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছেন না। কিন্তু স্পষ্টভাবে তিনি অনুভব করেছেন একটা শীতল হাতের স্পর্শ, তিনি তখনই উঠে পড়েছিলেন। তাঁর মনে হল, তিনি যেন একটা প্রেতাত্মাজাতীয় কিছুকে ঘর হতে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। সাদা কাপড়ে আবৃত, তার মুখটা দেখা যায়নি। প্রেতাত্মা কি কোন নারীর? না নরের? সত্যিই কি কোন প্রেতাত্মাকে দেখেছেন তিনি, নাকি ঘরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়া জ্যোৎস্নারাতের আলোর ভেলকি? হয়তো তাই হবে। এই মনে করে রাণী আবার ঘুমাতে যান। আবারও সেই শীতল স্পর্শ! তিনি লাফিয়ে উঠলেন, না কোন প্রেতাত্মা বা কিছুই নেই, বাতায়ন দিয়ে কোন চাঁদের আলোও আসেনি। এবারে রাণী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রাজাকে ডেকে তুললেন, বললেন তাঁকে সব। "নিশ্চয়ই তুমি স্বপ্ন দেখছিলে," রাজা সান্ত্বনা দিয়ে রাণীকে বললেন, "জানি, বিদ্যাবতীর জন্য তুমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছ। সে ঠিক সেরে উঠবে। কোন ক্ষতি তার হবে না।"

রাণী খুব ধীরে নীচু স্বরে বললেন, "আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে তার ভয়ানক কিছু একটা হতে চলেছে। সত্যি ওর সম্বন্ধে আমার খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে। ভগবান, এই দুঃস্বপ্নের রাত অবসান করে তুমি ভোর এনে দাও।"

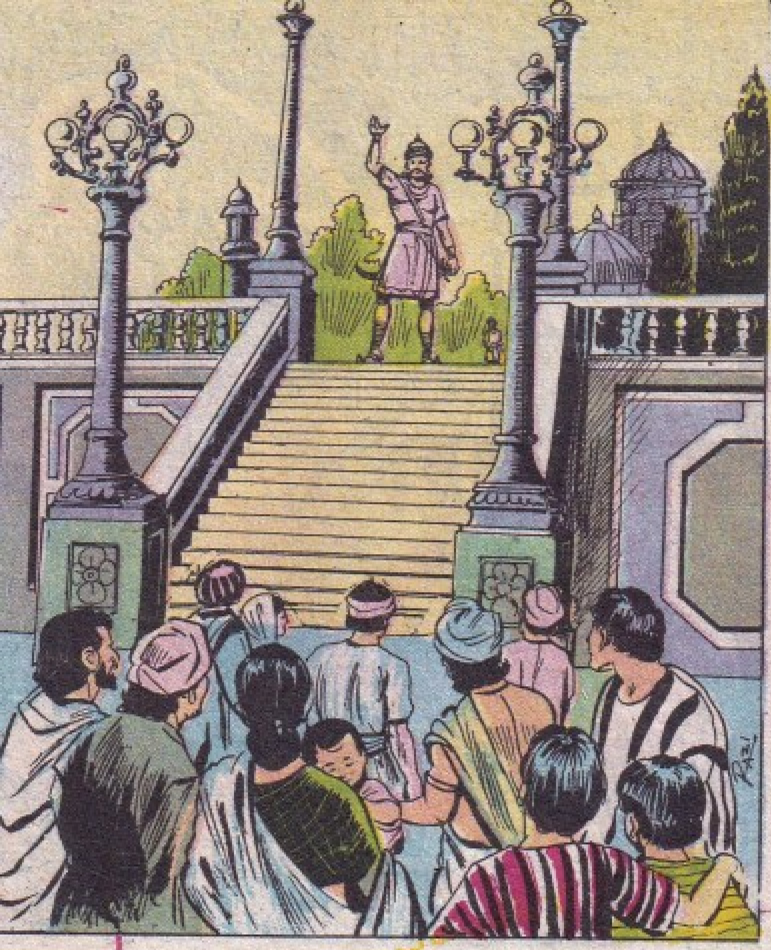
"একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর ব্রজেশ্বরী," প্রবোধ দিয়ে রাজা তাঁকে বললেন। "আর মাত্র দু'ঘণ্টা আছে সূর্যের আলো ফুটতে। তারপরই আমাদের দেখা হবে রাজবৈদ্যের



সাথে। আশা করছি, তিনি আমাদের সুখবরটাই দেবেন।"

তৃতীয়দিনের প্রভাতেও রাজকন্যার মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। রাজবৈদ্য তাকে আবার ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন; কোন মন্তব্য না করে কেবল বললেন যে, তিনি কিছু ওষুধ পাঠিয়ে দেবেন, রাজকন্যা যাতে শক্তি পেতে পারে।

সেদিনই সন্ধ্যায় রাজা অনুষ্ঠান বাতিলের কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন, যা শুনে প্রজাদের মনে হল তারা যেন জীবনের সমস্ত আনন্দ-সুখ হারিয়ে ফেলল। ষোলটি বৎসর ধরে রাজকন্যা এই দিনটিতে প্রজাদের সান্নিধ্য দিয়েছে, আনন্দ দিয়েছে। প্রাসাদের বাইরে যখনই সে দেবীমন্দিরে গেছে বা বন্ধুদের বাড়ী গেছে, তখনই



নাগরিকরা পথের দুধারে দাঁড়িয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তারা যেন তাদের কানকেই বিশ্বাস করতে পারল না যে, জন্মদিনের দিনটিতে রাজকন্যার মন্দিরে যাওয়ার বা রাজপথে শোভাযাত্রা সহকারে পরিক্রমা করার কোনই সম্ভাবনা নেই। প্রতি বৎসর এই দিনটি এত সমারোহে পালিত হয় যে প্রজারা এর জন্য সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু তাদের প্রিয় রাজকন্যার হঠাৎ একি হল? অবাক হয়ে তারা ভাবে, আর নিদ্রাহীন রাত্রি তাদের কেটে যায় এই আশায় যে হয়তো প্রভাতেই কোন সুখবর পাওয়া যাবে।

রাজপ্রাসাদের সামনে দলে দলে ভিড় করে তারা। কোন রাজকর্মচারী বা পরিচারিকাকে রাজপ্রাসাদ হতে বেরিয়ে আসতে দেখলেই ঘিরে ধরে তাকে নতুন খবরের আশায়, তাদের প্রিয় রাজকুমারী কেমন আছে।

দিন এভাবেই গড়িয়ে চলল। জন্মদিনের ঠিক আগের দিনটি। একজন রাজকর্মচারী প্রাসাদ হতে বেরিয়ে এসে অপেক্ষারত জনতাকে জানাল রাজার আদেশ, যে পরের দিনটিতে দেবীমন্দিরে এবং অন্যান্য সব মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হবে। আর সে নিজে চলেছে রাজজ্যোতিষীকে রাজভবনে নিয়ে আসার জন্য। সেই সঙ্গে সে আরো বলল, শঙ্কার কোন কারণ নেই। রাজকুমারীর অবস্থা একটু ভালর দিকে, এবং সে তখন বিছানায় নিজেই উঠে বসতে পারছে।

রাজকন্যার সুখবর শুনে লোকেরা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। পরের দিন তারা দলে দলে মন্দিরে গিয়ে রাজকন্যার আরোগ্যলাভ ও দীর্ঘজীবনের কামনা করে প্রার্থনা জানাল। তারা আশা করেছিল, মন্দিরে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজা বা রাণী হয়তো আসবেন, কিন্তু কেউই আসেননি। বরং রাজবাড়ীর লোকেরা এসে মন্দির হতে প্রসাদ নিয়ে গেছে। রাজজ্যোতিষী আচার্য বাচস্পতি রাজকন্যার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গণনা করে কি বললেন, তা জানার জন্য তাদের ভীষণ কৌতূহল।

সত্যি, জনতার জন্য অনেক খবরই জমা হয়েছিল। জ্যোতিষীর পরামর্শমত রাজকন্যা বিদ্যাবতীকে হ্রদের মাঝে দ্বীপে অবস্থিত রাজার গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। রাণীর একান্ত ব্যক্তিগত পরিচারিকা

বৃদ্ধা কমলা তার সঙ্গে গেছে, আর মাত্র ছয়জন মহিলা-ভৃত্য তাদের দেখাশোনা করবে। জ্যোতিষীর নির্দেশে রাজা ও রাণী মাসে মাত্র একটি দিন সেখানে গিয়ে কন্যার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবেন। এবং এরকম চলবে এগার মাস এগার দিন ধরে যতক্ষণ-না তার জন্মকোষ্ঠী অনুযায়ী কতকগুলি গ্রহের অশুভ প্রভাব কেটে যাচ্ছে। লোকেরা বুঝল, মধ্যরাতের অন্ধকারে কেন রাজ-কন্যাকে দ্বীপ-প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজকন্যা সুস্থ হয়ে উঠুক, সেটা তারা সকলেই অন্তর দিয়ে চায়। দেখতে দেখতে এগার মাস কেটে যাবে এবং তারা পরবর্তী জন্মদিনে আরও আনন্দ করতে পারবে।



রাজা বীরসেন এবং রাণী ব্রজেশ্বরী প্রাসাদে ফিরে এসে আগের দিনের ঘটনাগুলি নিয়ে একান্তে কথা বলছেন। রাজকুমারীর জন্মকোষ্ঠী দেখেই জ্যোতিষী ভুরুদুটি কপালে তুলে রাজা ও রাণীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "রাজকন্যার জন্মের পরেই তার কোষ্ঠী নির্মাণ করবার সময় তার এই দুঃসময়ের জন্য কি আপনাদের সাবধান করে দিইনি? সম্ভবত..."

"আমরা ঠিক মনে করতে পারছি না, আচার্য বাচস্পতি," জ্যোতিষীর অসম্পূর্ণ কথার মাঝে রাজা বললেন। "সর্বদাই হাসিখুশি প্রাণবন্ত ছিল, এই প্রথম সে এরকম অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার সামনে যে অশুভ কিছু ওত পেতে রয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্রও কল্পনা ছিল না। রাজবৈদ্যের কথানুসারে তার মধ্যে কোন অসুস্থতা নেই। তিনি কোন ওষুধই দিতে চাননি, কেবল পূর্ণ বিশ্রাম। অবশ্য তিনি ওষুধ পরে দিয়েছেন, যার জন্য সে অন্তত বিছানায় উঠে বসতে পারছে।"

এবারে রাণী শুরু করলেন, "কিন্তু আচার্যদেব, আজ ওর জন্মদিন। আপনি ভালভাবেই জানেন তার জন্মদিন পালনে আমাদের কখনও অন্যথা হয়নি। প্রজারাও অপেক্ষা করে থাকে তাকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য। সেজন্যই আমরা আপনার মতামত চাইছি। আচার্য বলুন, কি তার সঠিক হয়েছে। সে কি কোনদিনই ভাল হয়ে উঠবে না?" ভীষণ উৎকণ্ঠা রাণীর মধ্যে।

জ্যোতিষী বহুসময় নিয়ে মনোযোগ দিয়ে কোষ্ঠী গণনা করে বললেন, "যতদূর দেখতে পাচ্ছি, একটা অশুভ সময় পেরিয়ে চলেছে সে। বলা যায় গত একবছর ধরে সে



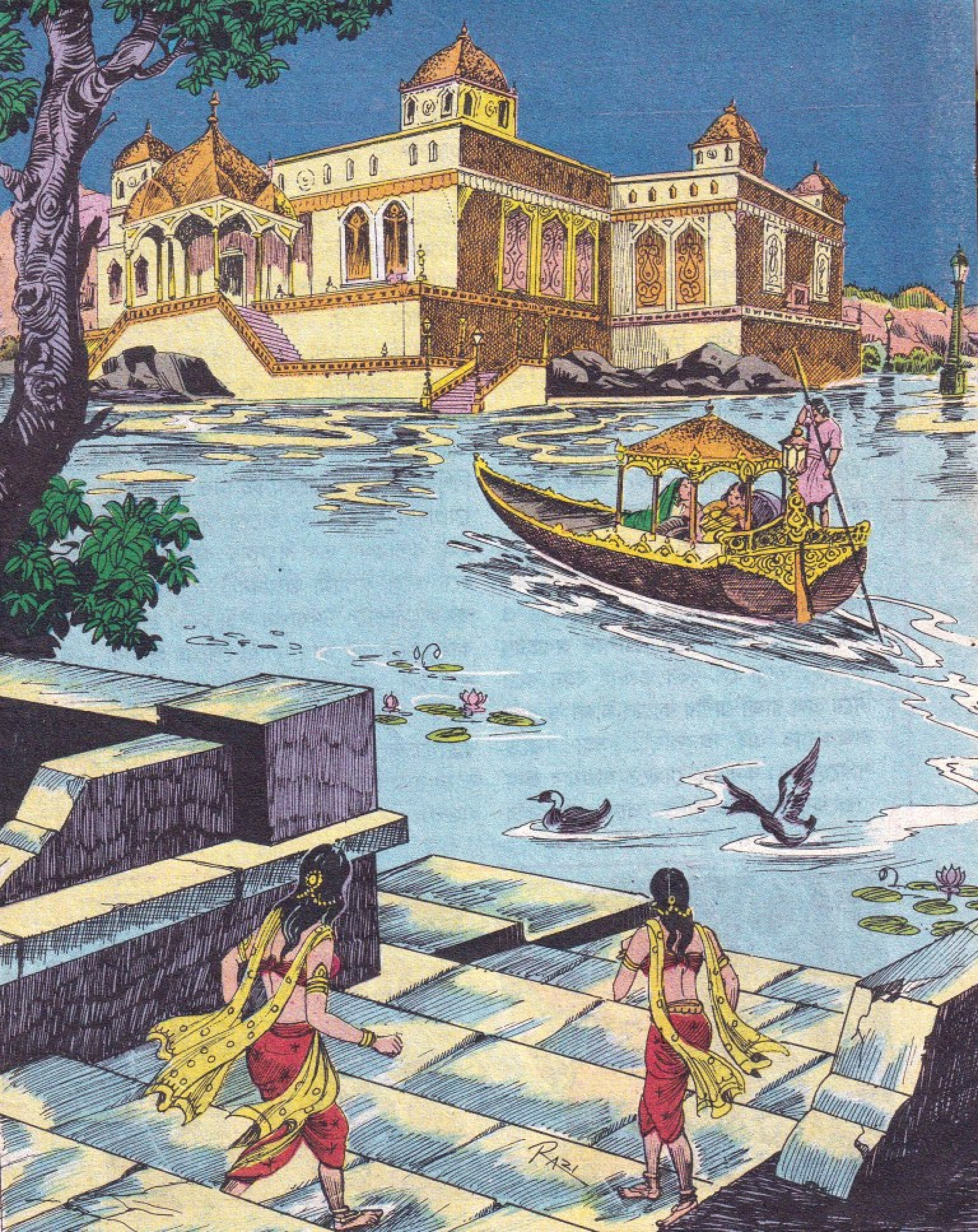
কতকগুলি দুষ্টগ্রহের দৃষ্টির মধ্যে পড়েছে। আরও এগার মাস এগার দিন এর প্রভাব থাকার পরই গ্রহগুলির অবস্থানে পরিবর্তন আসবে। ততদিন তাকে খুবই সাবধানে থাকতে হবে। অবশ্য তার জীবনের উপর আঘাত আসবে বলে মনে হয় না। তার একটা পরিবর্তন দরকার, আমি বলব তার বাসস্থানের পরিবর্তন—গ্রহগুলির স্থান-পরিবর্তনের পূর্বেই এটা প্রয়োজন।"

"কিন্তু আচার্যদেব," জ্যোতিষীর কথায় বাধা দিয়ে রাণী বললেন, "সে আমাদের ছেড়ে কিভাবে যাবে, কোথায়ই-বা যাবে?"

সকলেই নীরব। রাজা নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, "দ্বীপে অবস্থিত আমাদের গ্রীষ্মাবাসে...সেখানে গিয়ে সে থাকতে পারে কি? খুব বেশি দূর নয়, আমরা প্রত্যহই তাকে গিয়ে দেখে আসতে পারব।"

"এখান হতে ওই প্রাসাদের অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, তাই না?" রাজার কাছ থেকে সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে জ্যোতিষী পুনরায় বললেন, "আদর্শ স্থান। রাজকন্যার থাকার ব্যবস্থা ওখানেই হোক। একা থাকবে, খুব বেশি লোকের প্রয়োজন নেই। একজন মাত্র পরিচারিকা সেখানে থাকবে সবসময়, আর জিনিসপত্র খাবার প্রভৃতি নিয়ে অন্যেরা যাতায়াত করবে। তবে, সেখানে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না তারা। আপনাদেরও আমি পরামর্শ দেব যে মাসে মাত্র একটি দিন রাজকন্যাকে আপনারা দেখতে যাবেন, আর সেই দিনটিও আমি স্থির করে দেব। তার সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা পরিবর্তন চাইছি, এর জন্যই আমার এই নির্দেশ। অল্প সময় মাত্র; ধরে নিন আপনারা প্রায়শ্চিত্ত করছেন, কিন্তু আমি নিশ্চিত করে বলছি যে রাজকন্যা বিদ্যাবতী আগামী বছরেই সুস্থ হয়ে উঠবে। এমনকি, এই অশুভ সময় পার হয়ে যাওয়ার কদিন পরেই আমি তার শুভবিবাহের যোগাযোগ দেখতে পাচ্ছি। সৌভাগ্যবশত বর্তমানে আচার্য জগৎপতি আমার বাসস্থানে আছেন, তাঁর সঙ্গেও পরামর্শ করব।" রাজা ও রাণীকে পরামর্শ দান করে জ্যোতিষী বিদায় নিলেন।

পরের ঘটনাগুলি দ্রুত ঘটে গেল। রাজকন্যার যাওয়ার আগেই রাজা লোকজন পাঠিয়ে বাড়ীটি পরিষ্কার করিয়ে রাখলেন। রাণী তাঁর পুরনো পরিচারিকা বৃদ্ধা কমলাকে রাজকন্যার সাথে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

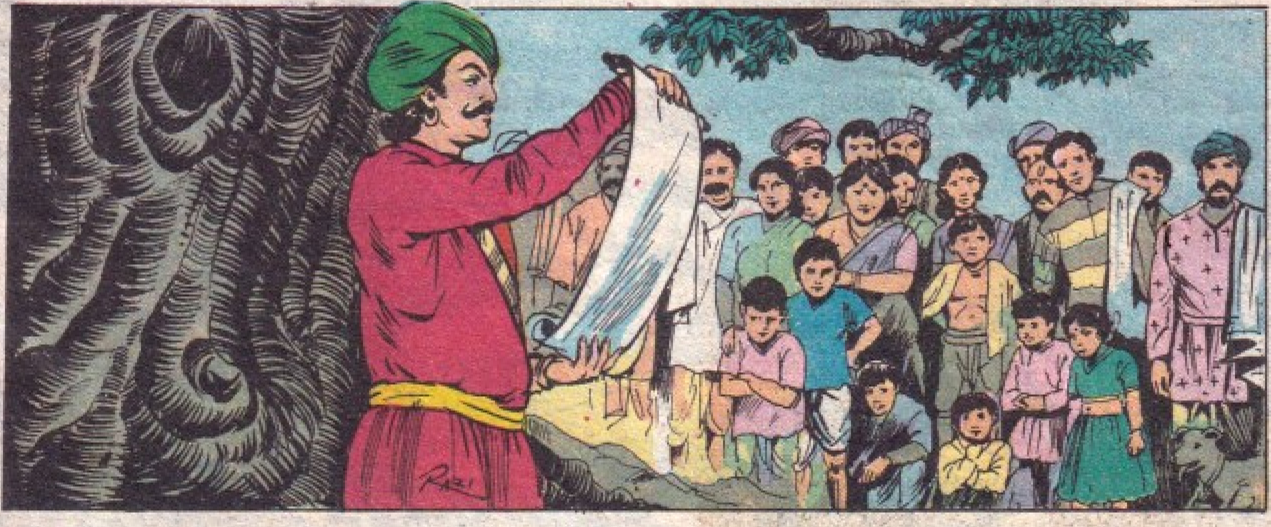

RAZI

বিদ্যাবতীর জন্ম থেকেই কমলা তার দেখাশুনা করেছে। সেখান থেকে সমস্ত পুরুষ কর্মচারীদের সরিয়ে আনা হল; ছয়জন পরিচারিকা ক্রমান্বয়ে রাজপ্রাসাদ হতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সেখানে নিয়ে যাবে এবং কাজ শেষ করেই ফিরে আসবে। কমলা বাদে ওখানে কেউ থাকবে না।

রাজজ্যোতিষীর নির্দেশমত ঠিক মধ্য-রাত্রে পালকিতে করে রাজকন্যাকে নিয়ে যাওয়া হল। রাজা ও রাণী তার সঙ্গে প্রাসাদের প্রধান ফটক পর্যন্ত কেবল এসেছেন। নৌকাতে ওঠা পর্যন্ত রাজকুমারীর সাথে বৃদ্ধা কমলা বাদে আরও দুজন পরিচারিকা ছিল।

মাঝি মূল ভূখণ্ডে এসেই অপেক্ষারত দুজন মহিলাকে জানাল যে, রাজকন্যা ও পরিচারিকা দ্বীপের ঘাটে নিরাপদে অবতরণ করেছে। তারা সে খবর তখনই বহন করে নিয়ে এল রাজা-রাণীর কাছে। রাজা ও রাণী রাজকন্যার এই অনুপস্থিতি সহ্য করতে পারছেন না। কন্যাকে দেখতে যাওয়ার জন্য রাজজ্যোতিষীর অনুমতি পেতে বেশ কটা দিন এখন অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু...। রাজকন্যার মঙ্গলের জন্য এই দুঃসহ বেদনা তাঁদের সহ্য করতেই হবে। কিন্তু, যে প্রজারা ফি-বছরে তার জন্মদিনে এত আনন্দ করে তাদের কাছে কি কৈফিয়ত দেবেন তাঁরা? প্রজারা অত্যন্ত দুঃখ পাবে।

শেষে তাঁরা লোক-মারফত রাজ্যের চারিদিকে ঘোষণা করে দেবার আদেশ দিলেন রাজকন্যার মঙ্গল ও আরোগ্যলাভের জন্য যা করা হয়েছে। প্রজাদের কাছে আবেদন জানান হল, তারা যেন অশান্ত বিশৃঙ্খল না হয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মে যোগদান করে। এবং তাদের আরো জানান হল, রাজকন্যা তার দুঃসময় কাটিয়ে ভাল হয়ে এলে আগামী জন্মদিনটি আরো বেশি জমকালোভাবে উদ্‌যাপন করা হবে। রাজার কাছ থেকে এই আশ্বাসবাণী পেয়েই প্রজারা শান্ত হল, এবং রাজ্য তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল। কিন্তু ততদিনই, যতদিন না বজ্রাঘাতের মত গ্রীষ্মাবাস হতে রহস্যজনকভাবে রাজকন্যার নিরুদ্দেশের খবর এসে না পড়ল। (ক্রমশ)





মাতৃদক্ষিণা—গুরুদক্ষিণা

দৃঢ়ব্রতী রাজা বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে এসে বৃক্ষশাখা হতে ঝুলন্ত শবদেহ নামিয়ে নিজ কাঁধে রেখে যাত্রা করলেন শ্মশানাভিমুখে। কিছুদূর যাবার পরেই শবস্থিত বেতাল বলল, "রাজন, মধ্যরাতে এই ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমিতে যেরকম ধৈর্য সাহস ও দৃঢ়তা দেখাচ্ছ তা সত্যি প্রশংসনীয়। তবে এর সাথে সাথে মনে হয় সময়ের জ্ঞান, লোকেদের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ও লক্ষ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়। এর অভাবে কার্যসিদ্ধি হলেও তার ফল ভোগ করা যায় না, ব্যর্থ হয়ে পড়ে সমস্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা। উদাহরণস্বরূপ তোমাকে সুনন্দ নামে একজনের কাহিনী বলছি। শুনলে তুমি বুঝতে পারবে; আর চলবার পথশ্রমও কমবে। শোন তাহলে।"

বেতাল তার কাহিনী শুরু করে:

রত্নগিরি রাজ্যে রাজা সুরসেনের রাজত্ব। সুরসেনের মন্ত্রী অত্যন্ত সৎ, বুদ্ধিমান, প্রতিভাসম্পন্ন। রাজা প্রতিটি বিষয়ে তার

বেতাল কথা



পরামর্শ নিত, রাজকার্যের প্রতিটি পদক্ষেপে তার উপর নির্ভর করত। মন্ত্রীর জন্যই সারা রাজ্য জুড়ে বিরাজ করত শান্তি। কিন্তু হঠাৎই মন্ত্রীর মৃত্যু হল। রাজা নতুন মন্ত্রীকে নিযুক্ত করে তার পরামর্শমত রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকে।

নতুন মন্ত্রী বুঝে গেছে, রাজা সম্পূর্ণভাবে তার উপরেই নির্ভরশীল। রাজা কোন কিছু বললে সর্বদাই তাতে সম্মতি জানাত। এসব কারণে রাজ্যশাসনে ক্রমশ শিথিলতা আসতে থাকে, বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়। কিছু লোক রাজাকে এ-ব্যাপারে সচেতন করে, কিন্তু রাজা তাদের কথায় কানই দেয় না। বরং বলে, "মন্ত্রীর পরামর্শমত কাজ করার ফলেই রাজ্যের প্রজারা এতদিন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেছে। যদি রাজ্যে কোন সঙ্কট ঘনিয়ে ওঠে, সেটা হবে তখনকারই সাময়িক ঘটনা, মন্ত্রীর জন্য নয়।"

অবশেষে সকলে গিয়ে রাজগুরুকে এর সুরাহা করতে বলে। গুরুজীও রাজাকে নতুন মন্ত্রী সম্বন্ধে একটু ভাবতে বলেন। তাঁকেও রাজা উত্তর দেয় হেসে, "গুরুজী, দেবকার্য সম্বন্ধে আপনার অসীম জ্ঞান থাকলেও রাজকার্য সম্বন্ধে অতটা নেই। ভূতপূর্ব মন্ত্রীর পরামর্শকেও প্রথমে সকলে ত্রুটিপূর্ণ বলত। নতুন মন্ত্রীর পরামর্শের মাহাত্ম্য বুঝতেও লোকেদের আরো কিছুদিন যাবে।"

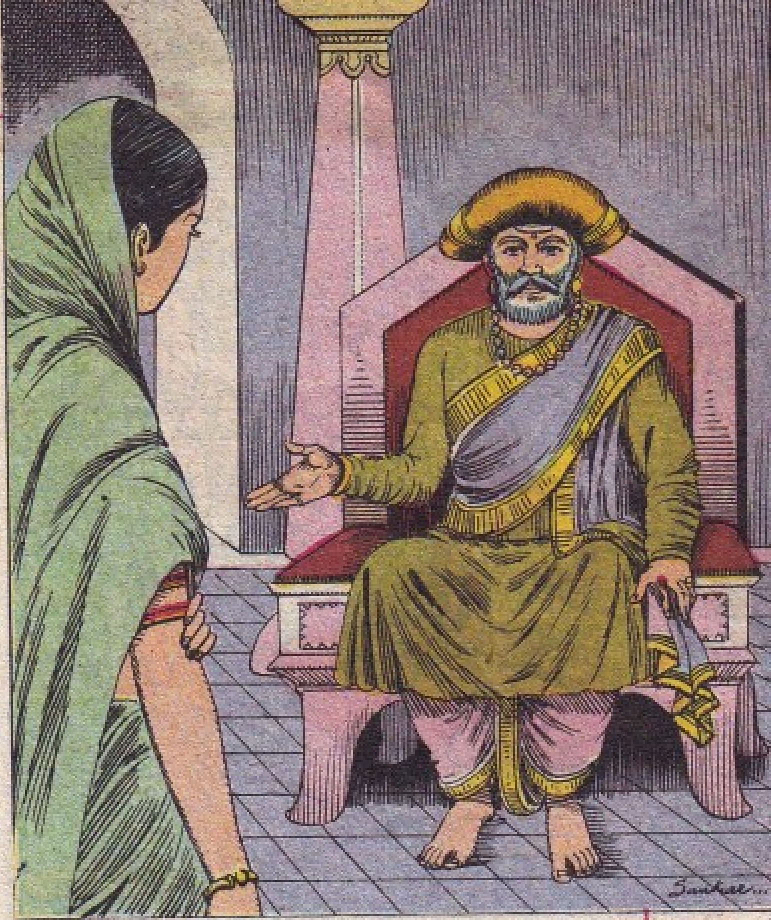
রাজগুরু আর কোন কথা বলেননি। তিনি সোজা চলে আসেন পূর্বতন মন্ত্রীর বাড়ীতে। মন্ত্রীর বিধবা পত্নী গুরুকে সমাদরে বসাল। গুরু তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "মহারাজা সুরসেন তোমার স্বামীর পরামর্শের প্রতি এত আস্থাবান ছিলেন যে, তাঁর ধারণা সকল মন্ত্রীই নিঃস্বার্থ প্রতিভাবান বুদ্ধিমান হবে। এখন যে নতুন মন্ত্রী এসেছে, সে একেবারে অপদার্থ অযোগ্য। রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে আনছে। আমি এসেছি তোমার কাছে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য একটা জিনিস চাইতে। তোমার পুত্রের বয়স এখন দশ বৎসর। দণ্ডকারণ্যে স্থিত ত্রিপাঠীর গুরুকুলে তুমি তাকে পাঠাও শিক্ষালাভের জন্য। তোমার পুত্রকে তিনি সাদরে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করবেন। বিশ্বাস করি, সেও তার পিতার মত প্রতিভাবান হয়ে ফিরে আসবে তাঁর শিক্ষায়। সে মন্ত্রী হোক, এটাই আমরা চাই। যতদিন তা না হয়, ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই অসমর্থ মন্ত্রীর হাত

থেকে রেহাই নেই।"

পূর্বতন মন্ত্রীর বিধবা পত্নী রাজগুরুর পরামর্শ মেনে নিয়ে তার একমাত্র সন্তান সুনন্দকে দণ্ডকারণ্যে ত্রিপাঠীর গুরুকুলে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাল। সুনন্দর অভিপ্রায় জেনে আচার্য ত্রিপাঠী বললেন, "জ্ঞানলাভের জন্যই গুরুকুল, মন্ত্রীপদ লাভের প্রস্তুতির জন্য নয়। আর, তোমার এ-বয়সেই মন্ত্রীপদের চিন্তা করা অনুচিত।

দশ বৎসরের বালক সুনন্দ আচার্যকে প্রণাম জানিয়ে দৃপ্তস্বরে বলল, "গুরুদেব, আমার পিতা মন্ত্রী ছিলেন। সর্বদাই সুপরামর্শ দিয়ে রাজ্যের মঙ্গল করেছেন এবং রাজ্যশাসনে রাজাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, এ অতি সত্য। কিন্তু আমার পিতার জন্যই রাজার মনে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে সব মন্ত্রীর পরামর্শই রাজ্যের জন্য মঙ্গলদায়ক এবং অত্যন্ত উপযোগী। এটা রাজার মনে গেঁথে বসে গেছে। এই ভ্রান্ত ধারণা রাজার মন থেকে দূর করার জন্য কিছু করা উচিত, এই নৈতিক দায়িত্ব আমারই। আমার পিতা যে ভুল করেছিলেন আমি তার সংশোধন করতে চাই মাত্র। রাজা রাজকার্যের ব্যাপারে অপরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হয়ে তাঁকে নিজের উপরই নির্ভরশীল হয়ে উঠতে হবে, সেটাই জানাতে চাই। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে চাই শুধু আমার পিতার ভুলের সংশোধনের জন্য। আমায় যোগ্য করে তুলুন শিষ্যরূপে গ্রহণ করে।"

সুনন্দর কথায় আচার্য সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "বৎস, তোমার মধ্যে রয়েছে অপূর্ব এক তেজ। তোমার চিন্তা, বাচনভঙ্গী ও যুক্তি তোমার বয়সের তুলনায় অনেক এগিয়ে। তোমার উপর আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, আমার মনে হচ্ছে তোমাকে সকল শাস্ত্র শিক্ষাদান করে, সর্ববিষয়ে কৃতী করে এই গুরুকুলের দায়িত্ব দিই। অবশ্য, যা তুমি বলেছ তাও সত্য। যেমন তোমার অভিপ্রায়। একটা কথা মনে রেখ, উঁচুদরের উপার্জনের লোভে যদি বিদ্যার্জন হয়, তবে সবই বিফলে যাবে।"



সেদিন হতেই শুরু হল তার বিদ্যাভ্যাস। আচার্য ত্রিপাঠী তাকে সর্বশাস্ত্রশিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যশাসন এবং সেই ব্যাপারে পরামর্শদানেরও শিক্ষা দিতে থাকেন। এভাবে তিনবৎসর কেটে গেল। সুনন্দই হল গুরুকুলের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী। তার পূর্বে যে-সমস্ত শিক্ষার্থীরা এসেছিল, তাদের তুলনায়



সর্ববিষয়েই সে অনেক এগিয়ে গেছে।

একদিন আচার্য ছাত্রদের সমাবেশে বললেন, "তোমাদের সকলেরই শিক্ষার অগ্রগতি লক্ষ্য করে আমি সন্তুষ্ট। সকলের প্রতিভা সমান নয়, তাই তোমাদের মধ্যে পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। এখনও শিক্ষা-কাল সম্পূর্ণ হয়নি। আমার আশা, তোমাদের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ, শিক্ষান্তে সেই স্বেচ্ছায় এই গুরুকুলের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। যোগ্যতমকেই আমি এই দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই। এই সঙ্গে বলি, দীপককুমারের সম্বন্ধে আমি খুব চিন্তান্বিত। এত বৎসর ধরে তার জন্য যে পরিশ্রম, মনে হয় তা ব্যর্থ হয়েছে। ফুটোপাত্রে জল রাখার ব্যর্থচেষ্টা।"

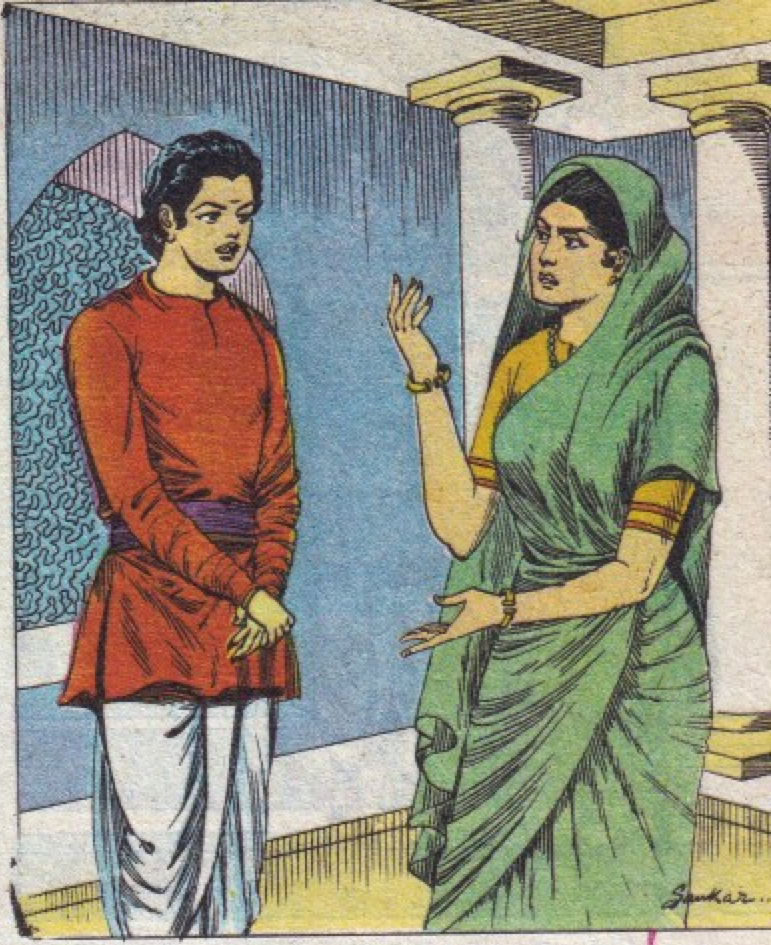
আচার্যের মন্তব্যে দীপককুমার রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "আমার জ্ঞান বুদ্ধি প্রতিভা যতটুকুই থাক, আমার ধারণক্ষমতা যেটুকুই হোক, তাকে বাড়িয়ে তোলাই যোগ্য গুরুর কাজ। সেক্ষেত্রে ব্যর্থতা আমার নয়, গুরুরই ব্যর্থতা। আমি মনে করি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছিলাম, তা আমার পূরণ হয়েছে। গুরু যখন সকলের সামনে আমাকে অপমান করলেন, তাহলে আর থাকার প্রয়োজনীয়তা কি? আমি এখনই বিদায় নিচ্ছি।" ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে দীপককুমার সেস্থান ত্যাগ করল।

আচার্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "হয়তো আমারই ব্যর্থতা। তার লক্ষ্য সে রাজ্যের গণ্যমান্য একজন হবে, উচ্চপদ লাভ করাই ছিল তার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। প্রকৃত শিক্ষা সে চায়নি।"

আরও তিনবৎসর অতিক্রান্ত হল। সুনন্দর শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। দীক্ষান্তে সে আচার্যকে প্রণাম জানিয়ে গুরুর অভিপ্রায় অনুযায়ী গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে তিনি বললেন, "যদি তুমি এই গুরুকুল চালনার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হও, তাহলে সেটাই হবে তোমার শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা।"

"সকল শাস্ত্রেই আছে, গুরুর চেয়ে মায়ের স্থান প্রথমে। মাতৃদক্ষিণা না দিয়ে আপনি যদি আমাকে গুরুদক্ষিণা দেবার জন্যই আজ্ঞা করেন তবে আপনার আদেশ শিরোধার্য।" সুনন্দ জানাল আচার্যকে।

আচার্য প্রসন্নচিত্তে সুনন্দকে আশীর্বাদ করে বললেন, "ষোল বৎসর বয়সেই তুমি এত বুদ্ধিমান ও যোগ্য হয়ে উঠেছ দেখে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলাম। কিন্তু তোমার এই সমৃদ্ধতর জ্ঞান ও যোগ্যতা কেবলমাত্র



রাজভবনের মধ্যে এক রাজাকে কেন্দ্র করে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকবে, সেটাই আমার চিন্তার কারণ। তোমার অন্তর্মন যেরকম চায় সেরকমই কর। তাই হবে আমার প্রতি তোমার গুরুদক্ষিণা। তোমার কার্যে তুমি সিদ্ধিলাভ কর; আমার আশীর্বাদ রইল।"

গুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ করে সুনন্দ নিজের রাজ্যে ফিরে এল। বাড়ীতে এসে জানতে পারল, রাজা সুরসেন অসুস্থ। তার পরিবর্তে রাজপুত্র বীরসেন শাসনব্যবস্থার পরিচালনা করছে। বীরসেন অত্যন্ত অহঙ্কারী ও দাম্ভিক। তার ধারণা, সমস্ত বিষয়েই সে বিজ্ঞ, পারদর্শী। তার কাছে মন্ত্রীর মূল্য অতি সামান্য। তাকে পরামর্শ দেওয়া নয়, তার মতের সাথে মিলিয়ে সায় দেওয়াই মন্ত্রীর প্রধান কার্য। পিতা সুরসেনের পরবর্তী মন্ত্রীকে সকলে অযোগ্য বলত, তাই বীরসেন এসেই সেই মন্ত্রীকে বিদায় করেছে। পরিবর্তে একজন নতুন মন্ত্রীর সন্ধান করে তাকে নিয়োগ করতে চাইছিল।

সুনন্দর প্রত্যাবর্তনে তার মা আনন্দিত-মনে দীর্ঘ অনুপস্থিতির সময়কার সমস্ত বিবরণ দিয়ে বলল, "তুমি সময়মত এসে গেছ। আগামীকাল মন্ত্রী নির্বাচন করবেন রাজা। আমার আশা, এই মন্ত্রীপদ গ্রহণ করে তুমি তোমার পিতার তুলনায় অধিক সুনাম অর্জন কর, নিজেকে অধিকতর যোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে।"

কিন্তু তা আর হল না। সেদিন রাতেই সুনন্দর ভীষণ জ্বর হল। জ্বর সেরে সুস্থ হয়ে উঠতে এক সপ্তাহ লেগে গেল। সেসময়েই রাজগুরু এলেন। সুনন্দকে দেখে বললেন, "আমি সবে জেনেছি যে তুমি এসেছ গুরুকুল হতে। নতুন মন্ত্রী নিয়োগ হয়ে গেলেও সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়নি। এখনই চল, রাজা বীরসেনের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। মনে হয়, আমি বললে সে দুজন মন্ত্রী নিযুক্ত করতে অরাজী হবে না। দেশের জন্য তোমার সত্যই প্রয়োজন।"

সুনন্দ সম্মত হল, কিন্তু রাজার কাছে যাবার পূর্বে নতুন মন্ত্রীর সঙ্গে সে একবার দেখা করবে। রাজগুরু সুনন্দর ইচ্ছানুযায়ী তাকে নিয়ে এলেন নতুন মন্ত্রীর কাছে। অবাক হল সুনন্দ! যাকে আচার্য অপদার্থ অযোগ্য বলেছিলেন, সেই দীপককুমারই নতুন মন্ত্রী!

দুজনের মধ্যে কুশল আদানপ্রদানের পর



রাজগুরু দীপককুমারকে তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করলেন। দীপককুমার খুশি হয়ে বলল, "একই রাজার কাছে যদি সুনন্দকে আমার সহকর্মী হিসেবে পাই, তবে তা হবে আমার পরম সৌভাগ্য।"

সুনন্দ গম্ভীরস্বরে বলল, "আচার্য বলেছিলেন, গুরুকুল পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমি যেন আমার গুরুদক্ষিণা প্রদান করি। তাঁর কথা অমান্য করতে পারি না।"

সুনন্দ সোজা বাড়ীতে এসে মাকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যের গুরুকুলে চলে গেল।

কাহিনী সমাপ্ত করে বেতাল বলল, "সুনন্দর ধারণা ছিল গুরুদক্ষিণার তুলনায় মাতৃদক্ষিণা বড়। সে কারণেই গুরুকুল থেকে সে বাড়ী ফিরে আসে মায়ের ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য। কিন্তু পরে কেন তার মতের পরিবর্তন হল? মন্ত্রী নির্বাচনের দিন জ্বরাক্রান্ত হওয়াকে কি সে দৈব ইচ্ছা বলেই ধরে নিয়েছিল? নাকি দীপককুমারের মত একজনের সাথে সহকর্মীরূপে কাজ করতে তার অপমানকর বলে মনে হয়েছে? যাকে আচার্য ত্রিপাঠী স্বয়ং অযোগ্য বলে ধিক্কার দিয়েছিল, তার সঙ্গে অপমানকর হলেও কি সুনন্দর মন্ত্রীপদ গ্রহণ করা উচিত ছিল না। সেসময়ে তার নিজের পক্ষে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা যে কত প্রয়োজনীয় ছিল, সেকথা তার খেয়াল হল না? আচার্য যার এত প্রশংসা করেছে, সেই সুনন্দর মধ্যে সুবুদ্ধির অভাব হল কেন? আমার এই সন্দেহের সমাধান তোমার জানা সত্ত্বেও যদি তুমি না বল, তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

বেতালের প্রশ্নের উত্তরে রাজা বিক্রমাদিত্য বলল, "আচার্য ত্রিপাঠী সুনন্দকে বলেছিল, সে যেন তার মহৎ জ্ঞান ও বুদ্ধিকে একজন রাজাকে পরামর্শদানের জন্যই ব্যয় না করে, কেবলমাত্র ওই কাজের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ করে না রাখে। কিন্তু মায়ের মনোবাসনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যই সে ঘরে ফিরে আসে। এ প্রমাণ করে, সুনন্দর মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা কি বিশাল ছিল। কিন্তু যে নতুন মন্ত্রীকে রাজা নির্বাচন করেছে, তাকে দেখে স্বাভাবিক কারণেই চমকে উঠেছে। সুনন্দ সপ্রতিভ ছেলে, সামান্য অবসরেই সে ভাববার সুযোগ পেয়ে গেছে। নতুন রাজা বীরসেনের সম্বন্ধে জেনেছে, সে বেশ অহঙ্কারী এবং বুদ্ধিমান। যে রাজা বুদ্ধিমান

নয়, তার সঙ্গে একজন বুদ্ধিমান মন্ত্রী থাকলে সে যথোপযুক্ত পরামর্শ দান করে রাজাকে সাহায্য করতে পারে। আবার, রাজা যদি অতীব বুদ্ধিমান হয়, তবে তার মন্ত্রী বেশি বুদ্ধিমান হলেও তাতে কাজ হয় না। সেক্ষেত্রে রাজা তার বুদ্ধিমত কাজই করবে। এখানে এই দ্বিতীয়টিই প্রযোজ্য। রাজা বীরসেন নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করেই এমন একজন মন্ত্রীকে নিয়োগ করতে চেয়েছে, যে কেবল পদের অলঙ্কারস্বরূপ থাকবে। মন্ত্রীর মন্ত্রণার মূল্য তার কাছে নেই। একারণেই বীরসেন অনেক ভেবে দীপককুমারের মত একজনকে নির্বাচন করেছে। এক্ষেত্রে হয়তো রাজা অত্যন্ত প্রতিভাধর সুনন্দকে নিয়োগ করতে চাইত না। দ্বিতীয়ত, তাকে গ্রহণ করলে পরে কি হবে তাও সুনন্দর কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। রাজা বীরসেন ও মন্ত্রী দীপককুমার তাকে সহ্যই করতে পারত না। সূক্ষ্মবুদ্ধির ধারক সুনন্দ এসমস্ত সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিয়েছিল নতুন মন্ত্রীকে দেখে, এবং সেই মুহূর্তেই স্থির করে নিয়েছে যে, বহু সাধনালব্ধ ও কষ্টার্জিত জ্ঞানসম্পদকে নিছক এই কাজে ক্ষয় হতে দেবে না। মায়ের ইচ্ছা পূরণ হলেও তা মাতৃদক্ষিণা কোনমতেই হ'ত না। তাই সে গুরুদক্ষিণা দানের সুযোগ হতে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইল না। গুরুর অভিপ্রায় মত গুরুকুল পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে তার গুরুদক্ষিণাও দেওয়া হল, সেই সঙ্গে আরও বেশি করে অর্জিত শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োগ করতে পারল। মন্ত্রীপদে থাকলে সে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়ত, তার জ্ঞানের ক্ষয় হ'ত, কিন্তু গুরুকুলে প্রধানাচার্যের পদ নেওয়ার ফলে তার জ্ঞানের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ হল। এতেই তার ভবিষ্যৎ সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠবে। তাই সুনন্দর এই মত পরিবর্তনে মোটেই বোঝায় না যে তার সাধারণ বোধজ্ঞান, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সময়জ্ঞান সব লুপ্ত হয়ে গেছে।"

উত্তরদানের পরেই বেতাল শবদেহ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে পূর্বোক্ত গাছে আশ্রয় গ্রহণ করল।

(কল্পিত)



তিনটি প্রশ্ন

শ্রীপুরের জমিদারের অদ্ভুত এক খেয়াল। যখনই কেউ তার কাছে কোন চাকুরীর জন্য আসত, জমিদার তাদের ঠিক তিনটি প্রশ্ন করত। যারা পারত তাদের কাজে নিত, আর যারা না পারত, তাদের ভাগিয়ে দিত। কখনও কখনও খুব সহজ প্রশ্ন করত, আবার কখনও এমন প্রশ্ন করত যে কারও পক্ষেই উত্তর দেওয়া সম্ভব হ'ত না।

রুদ্র নামে একজন তার কাছে কাজের জন্য এল। লোকটি কানে খুবই কম শোনে। জমিদার তাকে খুব ভালভাবে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বলো তো কি এমন জিনিস যা হারিয়েও আবার ফেরত পাওয়া যায়?"

"অর্থ", রুদ্র উত্তর দিল।

"কোন্ জিনিস একবার হারালে আর কখনই ফিরে পাওয়া যায় না?" জমিদার দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল।

"রাত এবং দিন", রুদ্র স্পষ্ট জবাব দিল।

"উপকার যে পায়, সে কতদিন উপকার যে করে তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে?" জমিদার শেষ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করল।

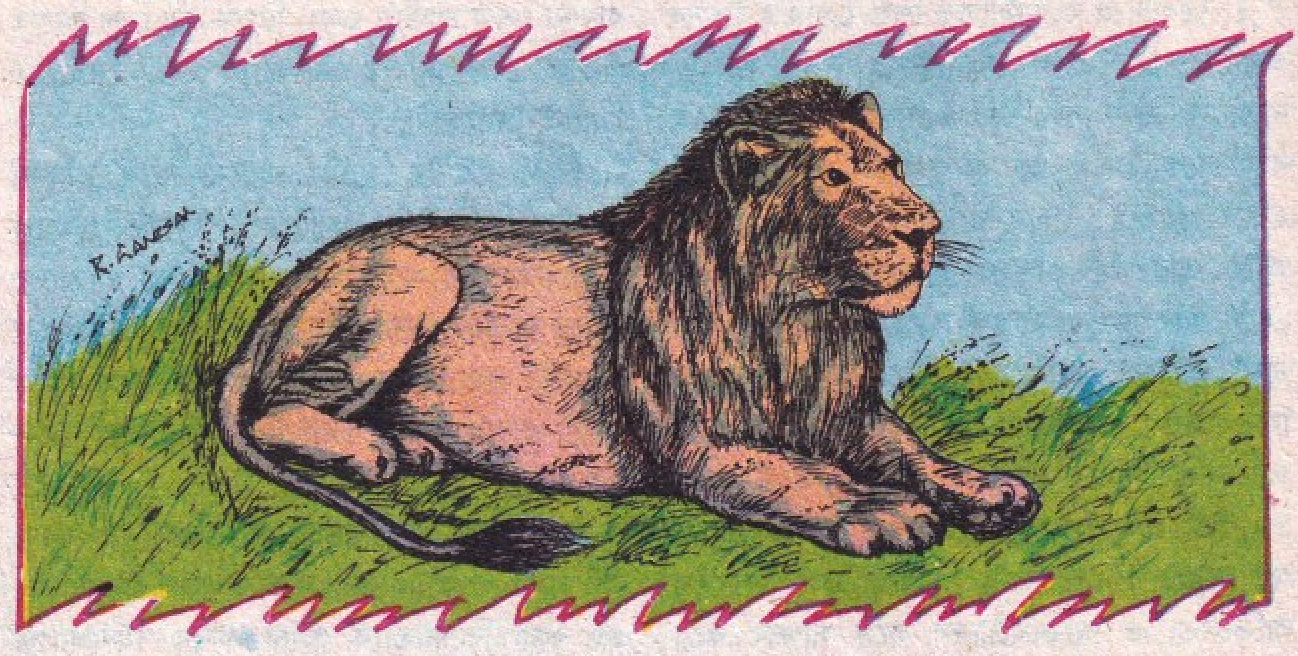
"আজীবন", রুদ্রের তৎক্ষণাৎ জবাব।

প্রশ্নের উত্তরে জমিদার খুশি হল, রুদ্রের চাকুরী হল। কিন্তু কিছুদিন যেতেই জমিদার জানতে পারল, রুদ্র কানে খুবই কম শোনে। জমিদার চমকে উঠল। তাকে ডেকে খুব জোরে জোরে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কালা হলে আমার প্রশ্নের উত্তর সেদিন এত সুন্দরভাবে কি করে দিলে?"

খুব জোরে বলাতে রুদ্র ভাল শুনতে পেয়েছে। সে বলল, "হুজুর সেদিনকার আপনার তিনটি প্রশ্ন বেশ মনে আছে। আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কি চাই। উত্তরে বলেছিলাম, অর্থ। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, কখন কখন তুমি কাজ করতে পারবে? আমার উত্তর ছিল, রাত এবং দিন। আর, শেষ প্রশ্ন করেছিলেন, কতদিন পর্যন্ত কাজ করতে পারবে? আমি বলেছিলাম, আজীবন।"

জমিদার বুঝল, রুদ্র কেমন কালা। কিন্তু তাকে কাজ থেকে সরাল না, কারণ সে তো ঠকায়নি তাকে। যেমন বুঝেছে তারই সত্য উত্তর দিয়েছে। তবে জমিদার সেদিন হতে প্রশ্ন করা বন্ধ করল।





ভারতীয় পশুপক্ষী

সিংহ

নিঃসন্দেহে বলা যায়, সিংহই বনের রাজা। আমাদের পঞ্চতন্ত্রের গল্পে বা ঈশপের গল্পে, সর্বত্রই সিংহের আবির্ভাব এবং সেভাবেই তাকে দেখান হয়েছে। এমন কোন পশু নেই, যে সিংহের এই আসন কেড়ে নিতে পেরেছে। আমাদের দেশ ভারতে, জাতীয় পশুরূপে বাঘ বর্তমানে চিহ্নিত হলেও সত্তর দশক পর্যন্ত সিংহকেই দেওয়া হয়েছে সেই সম্মান। সিংহ আবার দেবী দুর্গার বাহনও।

সত্যি, এর দেহের গঠন, গাম্ভীর্য এবং চালচলনে সর্বদাই রয়েছে এক রাজকীয় ভাব। পুরুষ সিংহের কেশর অদ্ভুতভাবে তার সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। কেশরসহ সিংহকে বিড়ালের মত দেখতে না হলেও এই জন্তুটিও কিন্তু বাঘের মত বিড়ালের প্রজাতি। একটি পূর্ণবয়স্ক সিংহের নাকের ডগা থেকে লেজের প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা হয় ২৭৫ সে.মি. এবং উচ্চতা ৯০ সে.মি.। গায়ের রং ধূসর হলদে, কেশরের দিকে ঈষৎ কালচে। দলবদ্ধভাবে এরা বাস করতে ভালবাসে এবং এক-একটি দলে বিভিন্ন বয়সের চার-পাঁচটি থেকে কুড়িটি পর্যন্ত সিংহ থাকে।

এক সময়ে আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্র সিংহের রাজত্ব ছিল। কিন্তু ক্রমে অধিকতর হিংস্র বাঘের আগমন ও আধিপত্যের ফলে এরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বলা হয়, এই বাঘের আমদানি ঘটে উত্তরের সুদূর সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে। বর্তমানে গুজরাটের গীর বনাঞ্চলকে জাতীয় উদ্যানে পরিণত করে সিংহের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। এর ফলে সিংহের বিপদ কমে যায়। এই সংরক্ষিত বনভূমিতে এখন প্রায় ২৩০টি সিংহ আছে।

ফিনল্যাণ্ডের ক্ষুদে সংবাদদাত্রী

গত নভেম্বর মাসে কেরালার রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের সময় সংবাদদাতাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে দশবর্ষীয়া এক বালিকাকে দেখে অন্যরা প্রথমে ভেবেছে, সে হয়তো আমন্ত্রিত কোন বিদেশীর কন্যা। কিন্তু বুকে আঁটা তার প্রতিকৃতিসহ সরকারী পরিচয়পত্রটি দেখে সকলের ভুল ভাঙল, অবাক হয়ে গেল। তার নাম আইনো হিক্কিনেন। এসেছে তার দেশ ফিনল্যাণ্ডের দূরদর্শনের প্রতিনিধি হয়ে। সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে চলচ্চিত্র উৎসবে এসে সমস্ত প্রদর্শিত ছবিগুলি দেখেছে ও তাদের সম্বন্ধে স্বদেশের দর্শকদের জন্য লিখেছে এবং ভারতের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করেছে। সে ছিল ফিনল্যাণ্ড হতে আসা সেখানকার দূরদর্শনের ছয়জনের মধ্যে একজন সদস্যা।

ত্রিবান্দ্রমে পৌঁছানমাত্র তাকে নিয়ে যাওয়া হয় উৎসব-প্রাঙ্গণে, শহরের প্রাণকেন্দ্রে টিলার উপরে অবস্থিত কনককুন্নু প্রাসাদে। প্রথম দর্শনেই যেন সে এই স্থানটিকে ভালবেসে ফেলে। তার পরে একপক্ষকাল ধরে উৎসব চলাকালীন সময়ে বহু ভারতীয় ছবি এবং অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে তার গভীর হৃদ্যতা জন্মে যায়। উৎসবের প্রাঙ্গণে পরিবেশিত বিশেষ কতকগুলি আঞ্চলিক ভারতীয় খাবার সে পছন্দ করে। কেরালা রাজ্যের খাবার তার খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাড়ী ফেরার সময়ে সে তার জিনিসপত্রের সঙ্গে গোল্ডেন বানানা (এক জাতীয় কলা) চিপস্-এর বেশ কয়েক প্যাকেট দেশে নিজের লোকেদের জন্য নিয়ে যেতে মোটেই ভোলেনি।

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী আইনো তার অবসর সময়ের বেশিরভাগ কাটিয়েছে দর্শকদের সঙ্গে আসা শিশুদের সঙ্গে মিশে, কখনও-বা প্রাসাদের বাইরে মনোরম উদ্যানে ঘুরে বেড়িয়েছে একাকী বা অন্যদের সঙ্গ দিয়ে। এ-সময়ে ফুলে ফুলে সমস্ত ভরে থাকার জন্য উদ্যানটিও তার খুব ভাল লেগেছে।

তার ভাষায় এটা নিছক এক উৎসব নয়, বরঞ্চ দৃষ্টি প্রসারিত করার জন্য এক অপরূপ মহোৎসব। এই কথা বিশেষভাবে বলার কারণ, ফিনল্যাণ্ডে শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র হয় না। সে তার দশ বৎসরের জীবনে টিভি-র পর্দায় বা প্রেক্ষাগৃহে যত ছবি দেখেছিল, তার দ্বিগুণ সংখ্যক ছবি সে দেখেছে এবারেই এই ত্রিবান্দ্রমে। কোন একটা বিশেষ ছবি নয়, যেন সব ছবিই তার মনে দাগ কেটে দিয়ে গেছে কোন-না-কোন কারণে। একটি মালয়ালম ছবি 'অভয়ম'—একটি দশ বৎসর বালককে তার মা সর্বদাই পড়াশুনা করার জন্য বাধ্য করত, কিন্তু সে গিয়ে আশ্রয় চাইত তার স্নেহশীল দাদুর কাছে—তার হৃদয়ে পাকা আসন করে নিয়েছে। পিয়ানোতে ওস্তাদ আইনো চিত্র অঙ্কন করতে, টেনিস খেলতে ভালবাসে। তার প্রিয় টেনিস স্টার, স্টেফি গ্রাফ।



প্রশ্ন কয়টির উত্তর জানা আছে কি?

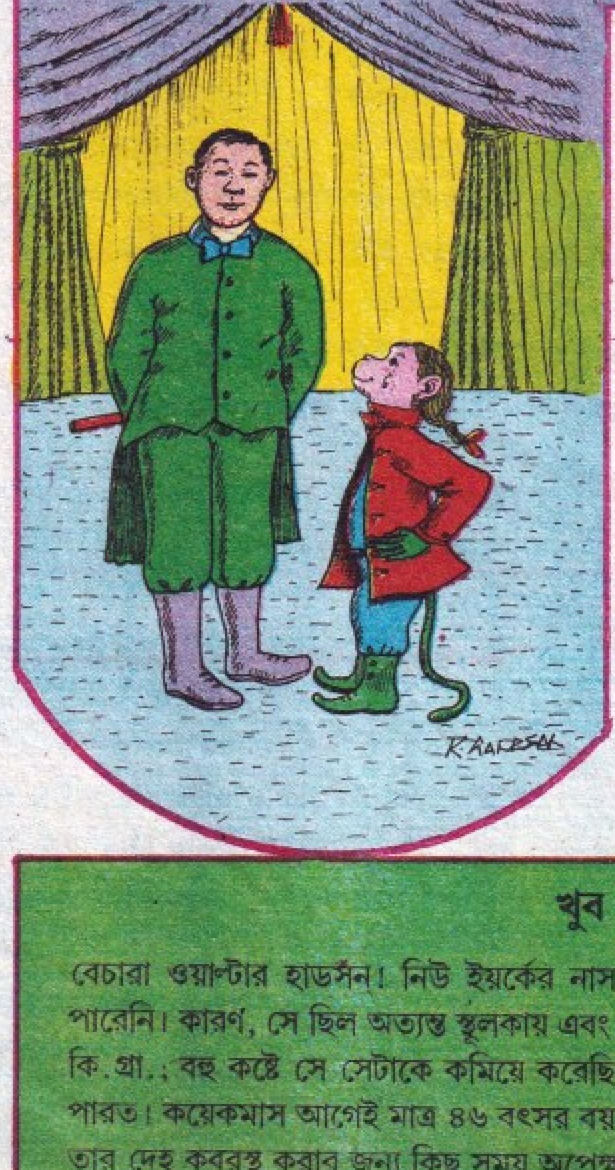
১। শূকর প্রজাতির সর্ববৃহৎ জন্তুটি কি?
২। জিপসিরা কোন্ ভাষায় কথা বলে?
৩। একটি শহরদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে একটি দেশ। কোন্ দেশ এবং কোন্ শহর?
৪। 'ঝর্ণা কলম' বা 'ফাউন্টেন পেন'-এর আবিষ্কর্তা কে?
৫। কোন্ মহিলা বৈমানিক সর্বপ্রথম একা আটলান্টিক মহাসাগর বিমানে পার হয়েছেন?
৬। একটি বাদে সব কয়টি সংখ্যাই রোমান হরফে লেখা যায়। সে সংখ্যাটি কি?
৭। কোন্ গ্রহকে 'লাল গ্রহ' বলা হয়?
৮। বিশ্ব-জুড়ে ডাক-বাক্সে লাল রঙের পূর্বে কোন্ রঙ ব্যবহার করা হ'ত?
৯। পুতুলের সৃষ্টি সর্বপ্রথম কোথায় হয়?
১০। কোথায় সর্বপ্রথম 'বাটিক পেন্টিং'-এর প্রচলন হয়?
১১। কাঁকড়া কিভাবে চলে?
১২। স্যার রজার ব্যানিস্টার কি কারণে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন?
১৩। সাদা হাতির দেশ কোথায়?
১৪। ১৯৬৭ সালে ডা. ক্রীশ্চিয়ান বার্নার্ড সর্বপ্রথম এক নতুন শল্যচিকিৎসা করেন। কি সেটা?
১৫। ১৯৯০ সালে প্রথম একজন সাংবাদিক মহাকাশে যান। তিনি ছিলেন জাপানের নাগরিক। তাঁর নাম কি?

উত্তরমালা

১। জলহস্তী।
২। রোমানী।
৩। দি ভ্যাটিকান, রোম শহর।
৪। লিউইস ওয়াটারম্যান।
৫। অ্যামেলিয়া এরহার্ট, ১৯২৮ সন।
৬। শূন্য।
৭। মঙ্গল গ্রহ।
৮। সবুজ রঙ।
৯। ভারত এবং মিশর।
১০। ইন্দোনেশিয়া।
১১। পাশের দিকে, সামনে নয়।
১২। তিনিই সর্বপ্রথম এক মাইল দূরত্ব চার মিনিটেরও কম সময়ে দৌড়ান।
১৩। সিয়াম, এখন থাইল্যাণ্ড।
১৪। হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট।
১৫। তোয়াহিরো আকিয়ামা।

আমেরিকার পথে বাঁদর-অভিনেতা

১৯৯২ সনটি জাপানবাসীদের কাছে "বাঁদর বর্ষ" রূপেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই জন্তুটির দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কারণ অতিপরিচিত বাঁদর-নাচ। অনেক কিছুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মজাদার বাঁদর-নাচ আজ সেখানে গলি থেকে রাজপথ পেরিয়ে স্থান করে নিয়েছে প্রেক্ষাগৃহের নাট্যমঞ্চে ও টিভি-র পর্দায়। জানা যায়, প্রায় হাজার বৎসর আগে এই বাঁদর-নাচ চীনদেশ হতে জাপানে আসে। ক্রমে এটি সেখানে একটা শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিন্তু ১৮৬০ সনের পরবর্তী দশকে জাপানে আসা পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবলভাবে নাড়া দিলে এই শিল্পে ভাটা পড়ে। তারপর ১০০ বছর পরে আবার এই বাঁদর-নাচ পুনরুজ্জীবিত হয় ও উন্নতির প্রয়াস চলতে থাকে। তা এত বেশি নৈপুণ্য অর্জন করেছে যে টিভি-র জনপ্রিয় বাঁদর-অভিনেতা 'জিরো' এবং তার প্রভু তারো মুরাসাকি 'হ্যামলেট'-এর জন্য মহড়া দিয়ে চলেছে এবং তা আমেরিকায় দেখানো হবে।





খুব বেশি কি!

বেচারা ওয়াল্টার হাডসন! নিউ ইয়র্কের নাসাউ-তে তার বাড়ী থেকে দীর্ঘ ১৮ বছর সে বেরোতে পারেনি। কারণ, সে ছিল অত্যন্ত স্থুলকায় এবং ভারী। এক সময়ে তার ওজন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৫৪৪ কি.গ্রা.; বহু কষ্টে সে সেটাকে কমিয়ে করেছিল ২৩৬ কি.গ্রা.। তখন সে মাঝে মধ্যে একটু বেড়াতে পারত। কয়েকমাস আগেই মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে সে মারা যায়। তখন তার ওজন ছিল ২৭২ কি.গ্রা.। তার দেহ কবরস্থ করার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়, যতক্ষণ না দেহটি একটু সঙ্কুচিত হয় এবং দরজা দিয়ে বের করা যায়।



রবিনের শিক্ষা

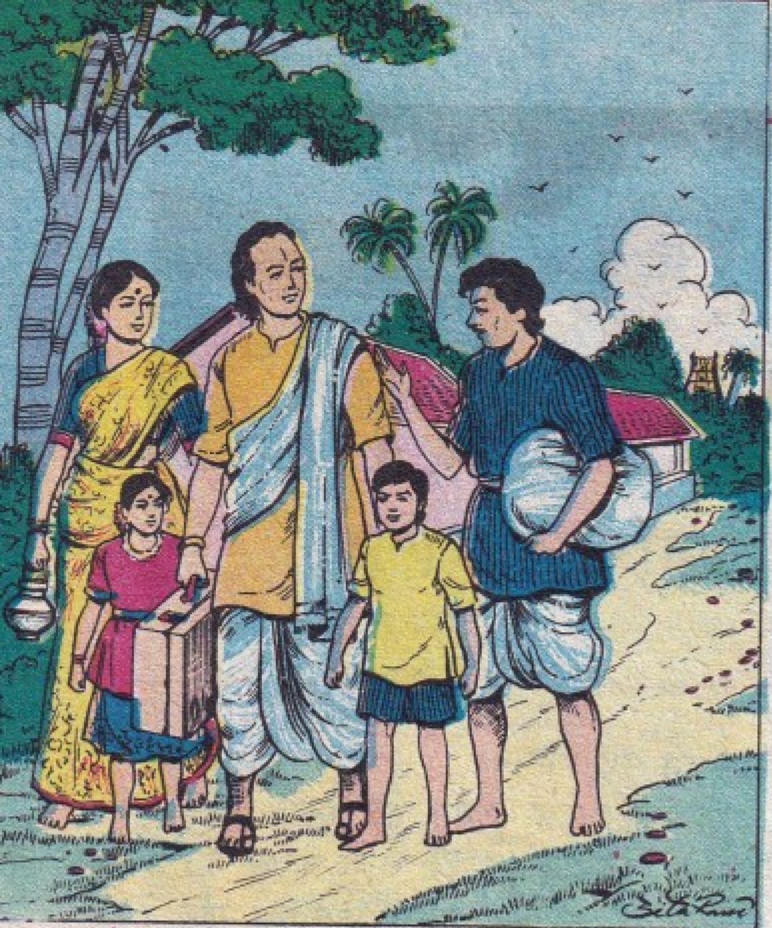
মনোহরপুরের রবিন, অদ্ভুত লোক একটা। বেকার ঘুরে বেড়ায় আর ভাঁড়ের মত মজা করে। মাঝে মাঝেই সে চীৎকার দিয়ে উঠত বিকট সুরে। নাকে নাকে কথা বলত। তাই লোকে ডাকত 'নেকু' বলে। তার নাকিসুরে কথা শুনে গ্রামের লোকেরাও মজা পেত।

নেকু রবিন কোন কাজ করতে চাইত না। বিনা পরিশ্রমে দিন যদি চলে যায় তবে কাজের কি দরকার। উদরপূর্তি করার জন্য তার নানা ফন্দী। সুযোগ খুঁজে বেড়াত যদি কারো বাড়ীতে খাওয়াটা হয়ে যায়। আর, যদি কোন বাড়ীতে কোন উৎসব থাকত তাহলে তো কথাই নেই। সে গিয়ে ঠিক খেয়ে আসবে সেই বাড়ীতে, বিনা নিমন্ত্রণে। বিয়ে হোক, বা অন্নপ্রাশন হোক, বা শ্রাদ্ধাদি কর্ম হোক, রবিনের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সেই বাড়ীতে অনুষ্ঠানের দিন গিয়ে এমনভাবে আলাপ জমিয়ে দেবে যে মনে হবে সে কত আপন।

খাওয়াদাওয়ার সময় সে বেশ বলে, "আমার শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না। তোমরা বলেছ, এর জন্যই এসেছি। যদি কম খাই, তোমরা ভাববে আমি অসুস্থ অবস্থায় আসার জন্য খেতে পারিনি। এখন খেতে না পারলেও তোমাদের নিরাশ করব না। সুস্থ থাকলে একাই তিন-চারজনের খাবার খেয়ে নিই। আজ আর ততটা পারব না। আমাকে দিয়ে দিও, সঙ্গে নিয়ে যাব, পরে খাব। তোমাদের মনে দুঃখ দিয়ে আমার কি লাভ!" এই বলে সে যতটা পারত খেত পেটভর্তি করে, তারপর সঙ্গে করে নিয়েও যেত।

কিন্তু একই জিনিস আর কতদিন চলে? ধীরে ধীরে রবিনের সম্বন্ধে গ্রামের সব লোক জেনে গেছে, তার কারসাজিও বুঝে ফেলেছে। তাই তারা সঙ্গ লোকে এড়িয়ে চলে। আর সেও এখন খাবারের জন্য

মোহন চৌধুরী



গ্রামের লোকেদের উপর নির্ভর করে না। নতুন লোক দেখলেই তাদের পিছন ধরে। তাদের কাছেই সুবিধা আদায় করে।

একদিন রবিনের চোখে পড়ল গ্রামের কাছারিতে কাজ পেয়েছে এমন এক কর্মচারীর উপর। ওই গ্রামে একেবারে নতুন। নাম বদ্রীনাথ। সপরিবারে যাচ্ছে। তারই মধ্যে রবিন এসে তাদের সঙ্গে আলাপ জমাল। রাস্তায় তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে তাদেরই একটা মোট বয়ে নিয়ে তাদের বাড়ীতে গিয়ে খেয়েদেয়ে নিজের বাড়ী ফিরে এল।

আবার আরেকদিন। দেখল নতুন একজন লোক কলাপাতা, আমের পল্লব, ফুল নিয়ে যাচ্ছে। রবিন দেখেই বুঝল, আমের পাতা যখন হাতে, তখন নিশ্চয়ই কোন পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান হবে। সে আলাপ জমাল গায়ে পড়ে। জেনে নিল তার নাম শিবনাথ। বাড়ীতে সেদিন ত্রিনাথের পূজা। সেই উপলক্ষ্যে কিছু লোক আসবে।

সমস্ত জেনে নিয়ে রবিন বিস্ময়ে বলল, "আরে আপনি একথা এত দেরীতে বলছেন কেন? আগে আমাকে জানালে আমিও কাজেকর্মে কিছু সাহায্য করতে পারতাম। যাক্ আপনি ঠিক কাজই করেছেন। ঘরে যখন পূজার অনুষ্ঠান হচ্ছে তখন এই পুণ্যসময়ে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে একসাথে ভোজন করাই শ্রেয়। তবে ভোজনের জন্য সর্বেশ্বর শাস্ত্রীকে বলেছেন, তাকে দুই-তিন দিন দেরীতে বললে কি এমন ক্ষতি হ'ত? গ্রামেরই লোক, সর্বদা পাওয়া যায় তাকে। আপনি গ্রামে নতুন এসেছেন, আপনার নানারকম সাহায্যের দরকার। আমি ঠিক সময়ে চলে আসব, মোটেই দেরী করব না। আচ্ছা, আপনি শ্যামাচরণবাবুর বাড়ীতেই ভাড়া আছেন, তাই না?" বলেই আনন্দের সাথে জোরে চীৎকার করে উঠল।

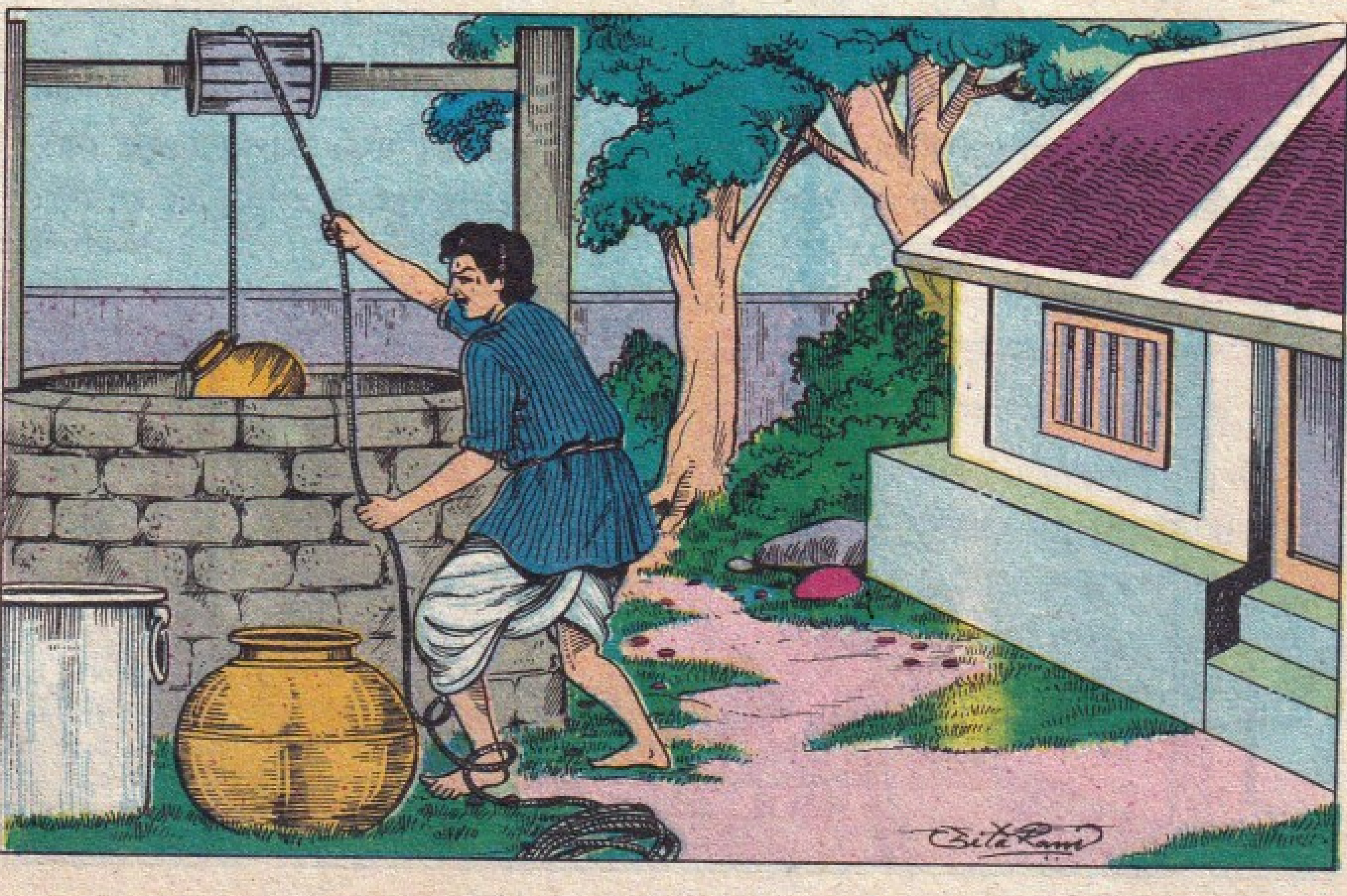
সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোক, একা এত কথা বলে গেল। শিবনাথের বিস্ময় জাগল, নিজে থেকেই খেতে আসতে চাইছে, আশ্চর্য! না করা যায় না। সে অপ্রস্তুত হয়েই বলে দিল, "হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই আসবেন।"

কিন্তু রবিন সেদিন শিবনাথের বাড়ীতে এল না। সেদিনই পরে জানতে পারে গ্রামের পুরোহিত চলেছে তীর্থক্ষেত্রে; সপরিবারে। রবিন তার সঙ্গে দেখা করে বলল, "আমি

আপনার সেবা করতে চাই তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে। আমি থাকতে আপনি কেন কষ্ট করবেন। আপনি 'না' করবেন না।" এরকমভাবে মিনতি জানিয়ে জোর করেই তাদের সঙ্গে তীর্থক্ষেত্রে গেল। পুরোহিতের খরচে পনের দিন বাইরে কাটিয়ে গ্রামে ফিরে এল।

যেদিন ফিরে এসেছে, সেদিনই বিকেলে দেখা হল শিবনাথের সাথে। তাকে দেখে শিবনাথ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রবিন তাকে বলার কোন সুযোগ না দিয়েই বলল, "রাগ করবেন না। হয়তো শুনেছেন যে, আমি তীর্থক্ষেত্রে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার যাওয়া হল না। জানি, আপনার রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। ঠিক আছে, আমি এর শাস্তিস্বরূপ কালই সকালে আসব, সারাদিন থাকব, ওখানেই স্নান খাওয়া করে রাতে ফিরব। কি খুশি তো? কাল সকালেই।" তারপর শিবনাথের কাঁধে হাত দিয়ে কিছুটা সময় গল্প করে বিদায় নিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরের খাওয়ার আগে রবিন গিয়ে হাজির হল শিবনাথের বাসাতে। শিবনাথের বৃদ্ধা পিসিমা, 'তুই' বলেই সকলকে ডাকাডাকি করে। রবিন শিবনাথের বাসাতে পা দিয়েই আনন্দে চীৎকার করল একটা। চীৎকার শুনে সকলেই বুঝল সে এসেছে। বৃদ্ধা পিসিমাও জোরে চীৎকার দিয়ে তাকে কাছে ডেকে বলল, "বা! এসে গেছিস! তোর সম্বন্ধে আমি সব জানি। তোর এই অভ্যাস এবার বন্ধ করতে হবে। ভূতের মতন পিছন লেগে থাকা, ভাল না। ওর জন্যই নাকি সুরে কথা। যাক, কুয়ো থেকে জল তুলে ভাল মত স্নান করে নে। আর হ্যাঁ, রান্নাঘরে খাবার জল একেবারে



নেই। চার-পাঁচ কলসী জল দিয়ে আয় আগে। যা...” বৃদ্ধা এমনভাবে বলল যে তা পালন না করে নিস্তার নেই।

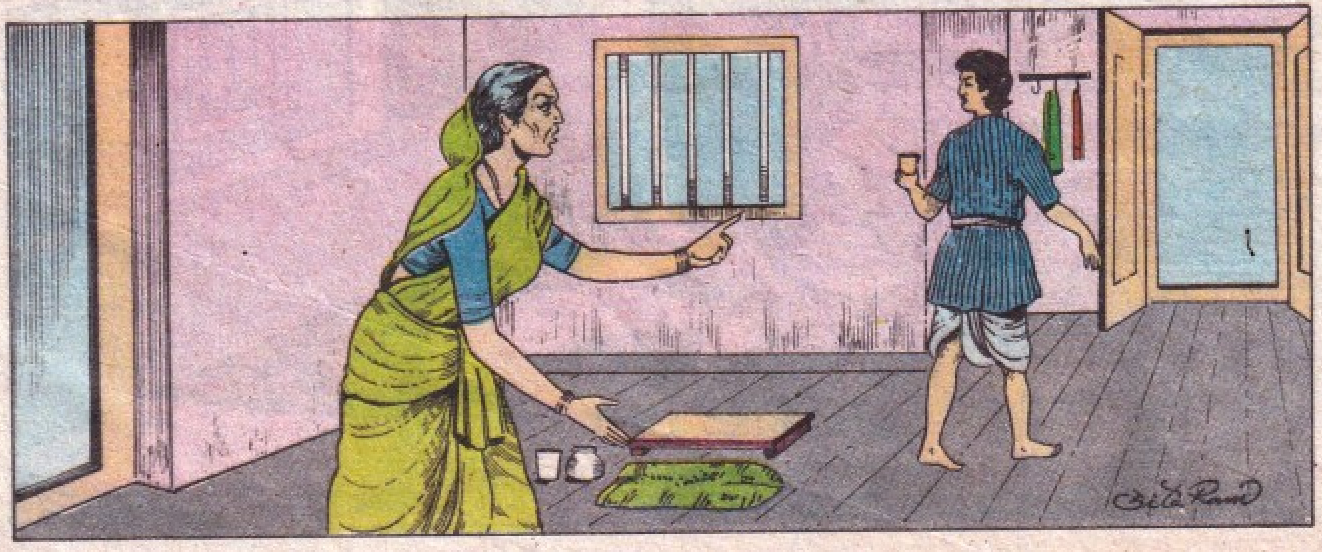
রবিন নিরুপায় হয়ে কুয়ো থেকে জল তুলতে গেল। কুয়োটা বেশ গভীর। চার-পাঁচ ঘড়া জল তুলেই বেশ হাঁপিয়ে উঠেছে। তাকে হাঁপাতে দেখে বৃদ্ধা চেঁচিয়ে উঠল, “কিরে সামান্য চার-পাঁচ ঘড়া জল তুলেই এই অবস্থা! হবেই তো, খাটবার অভ্যাস নেই তো, লোকের বাড়ী ঘুরে ঘুরে খাওয়া জুটলে আর কি দরকার। যা, এবারে স্নান করে খেয়ে নে।”

স্নানের পরে খেতে বসেছে। থালায় দেওয়া মাত্র সে এক নিমেষে তা শেষ করে দিচ্ছে। দেখে বৃদ্ধা বলল, “শুনেছি তুই রাতেও খাবি। তাই তোর জন্য দুবেলার রান্নাই হয়েছে। কিন্তু এখনই সব শেষ করে দিলে রাত্রে কি খাবি? তাছাড়া, তুই প্রথমদিনই যদি এরকম খাস তবে দ্বিতীয়দিন খাওয়ার জন্য তোকে কে ডাকবে? মানুষ হয়ে জন্মেছিস যখন তখন একটু লজ্জাশরম তো রাখতেই হবে। নে, ভাল করে খেয়ে নে।”

আজ পর্যন্ত রবিনের এরকম অস্বস্তিকর অবস্থা কোনদিন হয়নি। বৃদ্ধার কথাগুলি সূঁচের মত লাগছে। এরকম অপমানের কথা কেউ বলেনি আগে। তার চোখদুটি জলে ভরে উঠল। চুপচাপ খাওয়া শেষ করে সে উঠে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে বৃদ্ধা বলল, “আরে কোথায় চললি! এঁটো পাতা কে তুলবে? একেবারে কাণ্ডজ্ঞান সব বিসর্জন দিয়েছিস! দু’চারটা কথা বলে তুই পরের ঘরে খেয়ে বেড়াস বিনা পয়সায়, আর আমি তোর এঁটো পাতা ফেলব! আমার নিষ্ঠাজ্ঞান আছে রে, আছে। যা, এটা রাস্তায় ফেলে এসে এখানে গোবরজল ছিটিয়ে দে।”

রবিনের মুখে সাড়া নেই। বৃদ্ধা যা বলছে তাই করছে। সবশেষে ছাড়া পেয়ে যখন সে ওই বাড়ী থেকে বেরল, তখন তার ভিতরটা যেন হাউ হাউ করে কাঁদছে। অপমানের জ্বালা তার সর্বাঙ্গে।

এরপর আর কোনদিন রবিন যায়নি কারও বাড়ীতে। যখন আপন ভেবে কেউ তাকে ডেকেছে তখনই গেছে, এছাড়া নয়।





যোগ্যতার পরীক্ষা

এক সময়ে অবন্তীরাজ্যের রাজা ছিলেন বীরসিংহ। সুশাসক হিসেবে বীরসিংহ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। যদিও এর পিছনে ছিল রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলের কৃতিত্ব; তার চেয়েও বেশি কৃতিত্ব ছিল আরেকজনের। তিনি ছিলেন রাজা বীরসিংহের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা জয়ানন্দ।

জয়ানন্দের বয়স হয়েছে, স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাজার মনে হল, এবার একজন নতুন পরামর্শদাতা নিয়োগ করার সময় এসে গেছে। কিন্তু যিনি আসবেন, তিনি কি জয়ানন্দের মত সূক্ষ্মচিন্তাশক্তির অধিকারী হবেন? বহু জটিল সমস্যার তিনি সহজ সমাধান করে দিয়েছেন, তাঁর মত কি তার্কিক মনের অধিকারী পাওয়া যাবে! নতুন পরামর্শদাতা নিয়োগ করা প্রয়োজন, কিন্তু কিভাবে? রাজার কাছে এক বিরাট সমস্যা বলেই মনে হল এই মনোনয়নের কার্য সমাধা করা।

রাজার সমস্যার সমাধানকল্পে মন্ত্রী বলল, "মহারাজ, প্রথমে দেশের রাজনীতিবিদ, অর্থ ও ন্যায়শাস্ত্রবিদদের মধ্যে থেকে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালীদের আমরা নির্বাচন করে রাখতে পারি। জয়ানন্দের পরামর্শ নিয়ে পরবর্তী কাজ সম্পন্ন করা যাবে।"

রাজার সম্মতি লাভ করে রাজ্যময় ঘোষণা করে তাদের আহ্বান জানান হল। সাড়া পাওয়া গেল প্রচুর। নানা বিষয়ে পরীক্ষা হল তাদের। এই নির্বাচনী পরীক্ষায় জয় ও বিজয় নামে দুই যুবক সর্বোচ্চ স্থান লাভ করল। দুজনেই সমান। এদের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার কাজ স্বয়ং জয়ানন্দের।

জয়ানন্দকে জানান হল। জয়ানন্দ শুনে বললেন, "ব্যক্তিগত পরামর্শদাতার শাস্ত্রজ্ঞান থাকাটাই যথেষ্ট নয়, সূক্ষ্মবুদ্ধি ও স্বচ্ছ মনের অধিকারীও তাকে হতে হবে। জয় এবং বিজয় সমান প্রতিভাসম্পন্ন, এদের

অলোক সেনগুপ্ত



মধ্যে কে অধিক যোগ্য তার একটা পরীক্ষা নিতে হবে।" মন্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন তাকে কি করতে হবে।

পরের দিন মন্ত্রী জয় এবং বিজয়কে ডেকে সমাদরে কাছে বসিয়ে বলল, "এই সেদিন আমার এক প্রিয়বন্ধুর দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে মৃত্যু হল। এর সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। তোমাদের বলছি।"

"বন্ধুর নাম দয়াবান। বৃদ্ধ হয়েছে, সেই সঙ্গে হৃদরোগেও একবার আক্রান্ত হয়েছিল। একদিন রাত্রে সে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখল। এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে সে রয়েছে, কোথাও যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বেশিক্ষণ থাকাও যায় না, তাই পথের সন্ধানে এগিয়ে চলল। চলতে চলতে অবশেষে পৌঁছল একটা বিরাট ফাঁকা মাঠের ধারে। বেলা শেষ হয়ে আসছে। সেই গোধূলির আলোতেই দূরে দেখতে পেল চৌরাস্তার এক মোড়। এল সেখানে, কিন্তু কোন্‌দিকে যাবে? সব রাস্তাই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগিয়ে গেছে চড়াই-এর দিকে।

"একটা রাস্তা ধরে দয়াবান চলেছে পাকদণ্ডীর পাক খেয়ে। কিছুটা যাবার পরই দেখল, সামনেই রাস্তা বন্ধ। কাঁটা ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি। মনে হল রাস্তাটা যেন নেমে গেছে তার পরে। এগিয়ে এসে ঝোপ একটু সরিয়ে দেখেই অবাক হয়ে গেল। সামান্য দূরেই কয়েকটা সিংহ ঘুরছে। ঝোপের নড়ার শব্দে একটা সিংহ দয়াবানকে দেখতে পায়। গর্জন করে সে ছুটে আসে দয়াবানের দিকে। দয়াবান ভয়ে প্রাণের তাগিদে পিছন ফিরেই দৌড়তে থাকে। দৌড়তে দৌড়তে ঢালু পথ বেয়ে সেই চৌরাস্তার মাথায় এসে থামে। পিছনে দেখে, আর সিংহ নেই।

"কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চলল দ্বিতীয় পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে উপরে। অন্ধকার নেমে এসেছে। কিছুদূর যাবার পর সে এক জায়গায় দেখল জোরালো আলো। ব্যাপারটা দেখার জন্য আরেকটু এগিয়ে দেখল, ঢিপির মত উঁচু জায়গার গর্ত থেকে মুখ বের করে ফণা তুলে অনেকগুলি সাপ। প্রত্যেকটির ফণার উপরে রয়েছে মণি। সেই মণিগুলি থেকেই আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকে দয়াবান। হঠাৎ সাপেদের মধ্যে একটা পাঁচফণাযুক্ত বিরাট সাপ দেখতে পেল দয়াবানকে। সঙ্গে সঙ্গেই হিস্‌হিস্ করে তেড়ে এল দয়াবানের দিকে। দয়াবান পিছন ফিরেই দৌড় লাগাল ঢালু

পথ বেয়ে। নেমে এল সেই আগের চৌমাথায়। সাপেরও কোন চিহ্ন আর নেই।

"অন্ধকার আকাশে তারাগুলি মিটমিট করে জ্বলছে। অন্ধকারে এই যথেষ্ট। দয়াবান তৃতীয় পাকদণ্ডীর পথ ধরে উঠে চলল। পথটা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা পাহাড়ী গুহার সামনে শেষ হয়ে গেছে। দয়াবান এগিয়ে চলল। আরো কিছুটা যাবার পরই গুহার সামনে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গুহার মুখের কাছেই পড়ে আছে মানুষের হাড়, কঙ্কাল। মুহূর্তমাত্র ভাবল দয়াবান। কিছু না দেখা গেলেও বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে ষোলআনা। পালিয়ে যাবার জন্য পিছন ফিরতে যাবে, এমন সময়েই গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক রাক্ষস। দেখেই দয়াবানের প্রাণ উড়ে গেল। চীৎকার দিয়ে পিছন ফিরেই প্রাণপণে দৌড় লাগাল। দৌড়তে দৌড়তে এসে থামল একেবারে চৌরাস্তার মাথায়।

"কিন্তু একি, পিছন ফিরে দেখে রাক্ষসও তাকে তাড়া করে আসছে। দয়াবান পাগলের মত চতুর্থ পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে দৌড়ে উপরে উঠতে থাকে। সে আর পারছে না। কিন্তু উপায় নেই, রাক্ষসও আসছে তাকে অনুসরণ করে। দয়াবান মরিয়া হয়ে উঠে চলল।

"ওই পথ এসে এমন জায়গায় শেষ হয়েছে যেখান থেকে যাবার আর কোন উপায় নেই। চড়াই পথের শেষেই গভীর খাদ নেমে গেছে। সেখানে এসে থামল দয়াবান। আর কোথায় যাবে সে! একদিকে গভীর খাদ, ঘন অন্ধকার। অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছে রাক্ষস। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ তার কাঁপছে। শেষপ্রান্তে একটা



পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে সে। তার কাঁপুনির চোটেই হোক বা আলগা পাথরের উপরে তার ভারের জন্যই হোক, পায়ের তলার পাথরটা খসে গেল। অতল অন্ধকারে সে তলিয়ে গেল।"

এই পর্যন্ত বলে মন্ত্রী জয় এবং বিজয়ের দিকে দেখে নিয়ে বলল তাদের, "শুনলে আমার বন্ধুর দেখা স্বপ্নের কাহিনী। আমার বন্ধু দয়াবান ছিল বৃদ্ধ, উপরন্তু হৃদরোগে একবার আক্রান্ত হয়েছিল। দুঃখের কথা, তার ঘুম ভাঙার ক্ষণকাল পরেই তার মৃত্যু হল। হয়তো দুঃস্বপ্নের ভয়ে।"

মন্ত্রীর মুখে স্বপ্নকাহিনী ও পরবর্তী ঘটনা জয় এবং বিজয় দুজনেই নীরবে শুনছিল। এখন মন্ত্রীর শেষ মন্তব্য ও মৌনতা দেখে বুঝল তাদের কিছু বলা উচিত, মন্ত্রী সেটাই চাইছে। জয়ই প্রথমে বলল কিছুটা গভীরভাবে ভেবে নিয়ে, "মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, স্বপ্নের প্রভাব স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির দেহ ও মনের উপর ভীষণভাবে পড়ে। আপনার বন্ধুর ক্ষেত্রে সেরকমটাই ঘটেছে। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ, হৃদরোগে আক্রান্ত রোগী। স্বপ্নে তিনি তিনবার ঘোর বিপদের মধ্যে পড়ে কোনক্রমে বেঁচে যান। চতুর্থবার তা আর সম্ভব হল না। অন্ধকার খাদের গহ্বরে তিনি পড়ে গেলেন। এই দৃশ্যগুলি থেকে যে ভীতি তাঁর ভিতরে জমে উঠেছিল, ঘুম ভাঙার পরে সেকারণেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। আপনার বন্ধুর মৃত্যুতে আমি ব্যথিত।"

মন্ত্রী এবারে বিজয়ের দিকে চাইল। তখন বিজয় হেসে বলল, "ক্ষমা করবেন আমায়। আপনার বর্ণিত স্বপ্নকাহিনী নিছক একটি কল্পনাপ্রসূত গল্পমাত্র। এর সত্যতা নেই।"

"কল্পিত কাহিনী?" তোমার এরকম মন্তব্যের যুক্তি কি?" মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করল।

বিজয় বিনয়ে বলল, "আপনি বললেন আপনার বন্ধুর ঘুম ভাঙার ক্ষণকাল পরেই মৃত্যু হল। তাহলে স্বপ্নের ঘটনা আপনি জানলেন কি করে?"

মন্ত্রী বিজয়ের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রশংসা করে সমস্ত রাজাকে এবং জয়ানন্দকে জানাল। রাজা বীরসিংহের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতারূপে বিজয়ই মনোনীত হল।



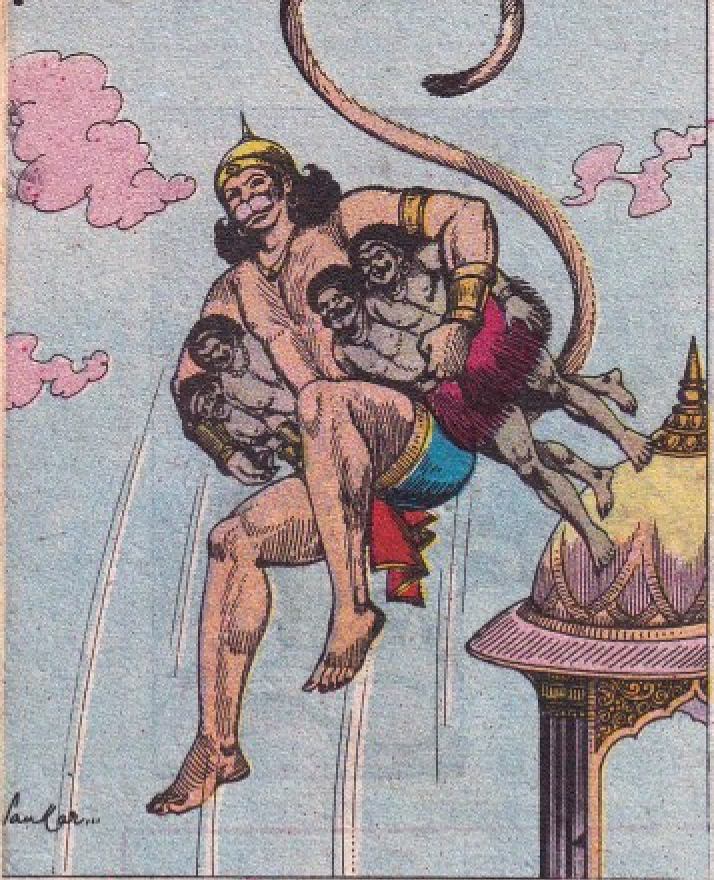


হনুমানের কথা

পূর্ব পরিকল্পনা মত আঘাত হানার জন্য প্রত্যেকে তৈরী হয়ে আছে এক-একটি দুয়ারের সামনে। প্রয়োজনের সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহায্য করার জন্য সুগ্রীব বিশাল বানরবাহিনী নিয়ে সদাজাগ্রত হয়ে রয়েছে উত্তর এবং পশ্চিম দুয়ারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। যুদ্ধের জন্য বানরেরা বড় বড় প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করে রেখেছে। লঙ্কানগর চারিদিক দিয়ে বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। চারিদিকে কেবল বানর আর বানর, যুদ্ধের উন্মাদনায় তাদের কোলাহল চীৎকার সবদিক সরব করে তুলেছে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে আরো একবার রামের চেষ্টা, যদি বন্ধ করা যায় এই সর্বনাশী যুদ্ধ। বিভীষণের সঙ্গে পরামর্শ করে অঙ্গদকে তাঁর দূতরূপে রাবণের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। রামের অভিপ্রায় জানিয়ে অঙ্গদকে ডেকে পাঠান হল। অঙ্গদ এসে উপস্থিত হলে রাম তাকে বললেন, দূত হিসেবে রাবণের কাছে তাঁর কিছু বার্তা বহন করে নিয়ে যেতে হবে। অঙ্গদ সানন্দে সম্মতি জানালে রাম বললেন, "তুমি রাবণকে বলবে: রাবণ, তুমি স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে বরলাভ করে অহঙ্কার ও গর্বে স্ফীত হয়ে একের পর এক অন্যায়কার্য করে যাচ্ছ। এবার তোমার দর্প চূর্ণ হবার সময় হয়েছে। আমার পত্নীকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছ তুমি, আমি এ-কারণেই তোমাকে আক্রমণ করতে এসেছি তোমার সাক্ষাৎ মৃত্যু হয়ে। আমি অপেক্ষা করে আছি লঙ্কাদুয়ারের সম্মুখে। কোন্ বল-পরাক্রমের উপর নির্ভর করে তুমি সীতাকে হরণ করেছিলে তা আমি জানি না, কিন্তু এবার তোমার সেই বল-পরাক্রম দেখাবার সময় হয়েছে। তার আগে

(২৩) বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ



আমি বলছি, এখনও সময় আছে। সীতাকে আমার হাতে প্রত্যর্পণ করে আমার চরণে আশ্রয় নাও, অন্যথায়, আমার ক্রোধাগ্নি এই বিশ্ব হতে রাক্ষসের বংশকে নির্মূল করে দেবে। আমার শরণাগত ধার্মিক বিভীষণ হবে এই লঙ্কার রাজা। যুদ্ধেই যদি তোমার বাসনা থাকে, এগিয়ে এসে যুদ্ধ কর। তবে আস আর না আস, আমার অস্ত্রের হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই। আর এক্ষেত্রে আমার একটি পরামর্শ, তুমি সাধ মিটিয়ে তোমার সাধের এই লঙ্কাকে দেখে নাও। এই তোমার শেষ।"

তারার পুত্র অঙ্গদ খুশিমনে রামের বার্তা নিয়ে চলল আকাশপথে উড়ে। ক্ষণিকের মধ্যেই এসে উপস্থিত হল রাবণের প্রাসাদে। রাবণ তখন মন্ত্রীপরিষদ-বেষ্টিত হয়ে আসছে মন্ত্রণাগৃহে। দরবারে আসার পথেই অঙ্গদ তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে কারোকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে সে বলতে শুরু করল নিজের পরিচয় দিয়ে। রামের বার্তা হুবহু জানাল রাবণকে।

রামের বার্তা শুনে সকলেই নীরব, চিন্তিত। রাবণও তাই। কিন্তু নিজের শঙ্কাকে বিন্দুমাত্র প্রকাশ হতে না দিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল, "এই বদমাশটাকে ধর, বন্দী কর। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।"

চারজন রাক্ষস এসে অঙ্গদকে ধরল। অঙ্গদেরও ধরা দেবার ইচ্ছা ছিল। একটু মজা করা যাবে। রাক্ষস চারজন তাকে এসে ধরামাত্র সে তাদেরই নিজের বগলের তলায় চেপে লাফিয়ে উঠল প্রাসাদের চূড়ায়। সেখান হতে চার রাক্ষসকে দূরে ছুঁড়ে দিল। প্রাসাদের চূড়া ভেঙে দিল। তারপর নিজের নাম উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে হুঙ্কার দিয়ে আকাশে লাফ দিয়ে ফিরে এল রামের কাছে।

অঙ্গদের সমস্ত কাণ্ড রাবণের চোখের সামনেই ঘটল। সমস্ত দেখল সে। মোটেই তার ভাল লাগল না। অস্বস্তি হতে থাকে তার, অধৈর্যে সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে।

বানরেরা যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। আদেশের অপেক্ষায় কেবল। মহাপরাক্রমশালী সুষেণ সুগ্রীবের আজ্ঞায় লঙ্কার প্রধান দুয়ারের সম্মুখে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এদিকে-সেদিকে পায়চারি করে। দুয়ারের অভ্যন্তরে দেখা যাচ্ছে, রাক্ষসেরাও হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত,



ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে।

কিছু রাক্ষসচর রাবণের কাছে গিয়ে সংবাদ জানাল যে, বানরসৈন্য লঙ্কানগর অবরোধ করে ফেলেছে সম্পূর্ণভাবে। রাবণ তাদের কাছে এই সংবাদ শুনেই গিয়ে উপস্থিত হল তার প্রাসাদের উপরিতলে ভগ্নচূড়ার নীচে। চারিদিকে দেখছে সে। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল বানর আর বানর। ছেয়ে আছে সমস্ত প্রান্তর জুড়ে। রাবণের ভাবনা, এই সংখ্যাতীত বানরবাহিনী ধ্বংসের উপায় কি?

রামও লঙ্কানগরের প্রাচীরের কাছে এসে দেখছেন, রাক্ষসসেনাদের প্রস্তুতি। কিভাবে রাক্ষসবীরেরা নগর প্রতিরক্ষার কাজে ব্যস্ত, বোঝবার চেষ্টা করছেন। দেখতে দেখতেই তাঁর মনে এল, এরই অভ্যন্তরে কোথাও সীতা বন্দী হয়ে আছে। তাঁর আশায় বুক বেঁধে রয়েছে। সীতার কথা মনে হতেই তাঁর মন দুঃখে ও রাগে ভরে উঠল। আদেশ দিলেন, "যুদ্ধ শুরু কর, শত্রু নিধন কর।"

বানরসৈন্যরা বহু পূর্ব হতেই এই আদেশের অপেক্ষায় ছিল। সেনাধিপতিদের আদেশ পাওয়ামাত্র তারা আঘাত হানল দুয়ারে দুয়ারে। দলে দলে বানরসৈন্য প্রাচীরের উপর উঠতে লাগল লাফিয়ে পরিখা পেরিয়ে। বিভীষণ তার অনুচর ও অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে রয়েছে রামের কাছাকাছি। গজ, গবায়, গবাক্ষ, গন্ধমাদন এবং শরভ—এই বানরবীরগণ আক্রমণরত বানরসৈন্যদের সহযোগিতা করছে।

রাক্ষসরাজ রাবণও আদেশ দিল যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধাদেশ পেয়ে উল্লাসে রাক্ষসসেনারা চীৎকার শুরু করল। যুদ্ধভেরী বেজে উঠল, রণদামামা শোনা গেল নগর-অভ্যন্তর হতে। যুদ্ধে লিপ্ত লঙ্কানগরের ভিতরে রাক্ষসসৈন্য এবং বাইরে বানরসৈন্যদের মিলিত চীৎকার আকাশ কাঁপিয়ে দিল।

দুই বাহিনীতে যুদ্ধ শুরু হল। রাক্ষসেরা গদা, বর্শা এবং অন্য অন্য অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর বানরেরা রাক্ষসদের উপর দূর হতেই ছুঁড়ে মারছে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড, বড় বড় গাছ। দুই পক্ষই আঘাত-প্রত্যাঘাত হানার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল।

বানরদের দেখে রাক্ষসসৈন্যরাও প্রাচীরের উপর উঠে তাদের আক্রমণ করে। কিন্তু এর ফলে বানরদেরই সুবিধা হল অনেক বেশি। প্রাচীরের উপর স্বচ্ছন্দে লাফালাফি করে তারা রাক্ষসদের আঘাত এড়িয়ে যাচ্ছে;



সামান্য ধাক্কাতেই তাদের প্রাচীরের উপর হতে ফেলে দিচ্ছে। নীচেও যুদ্ধ চলছে। কোথাও সমবেত ভাবে, কোথাও একক ভাবে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলেছে বীরেদের মধ্যে। ইন্দ্রজিতের সঙ্গে তুমুল লড়াই হচ্ছে অঙ্গদের। বিভীষণের এক মন্ত্রীর সঙ্গে লড়াই চলছে সম্পাতি ও প্রজঙ্ঘ নামে রাক্ষস-দ্বয়ের সাথে। হনুমান ও জম্বুমালীর মধ্যে চলেছে দ্বৈত লড়াই। এছাড়াও তপন নামক রাক্ষসের সাথে গজের, নিকুম্ভ রাক্ষসের সাথে নীলের যুদ্ধ চলছে। সুগ্রীব এবং প্রধস নামক এক রাক্ষসবীরের মধ্যে লড়াই চলছে। লক্ষ্মণকেও লড়তে হচ্ছে বিরূপাক্ষ রাক্ষসের সাথে। এরকম বহু রাক্ষস সেনানীর সাথে রামের অন্য অন্য বীর সাথীরা লড়াই করছে জীবন পণ করে।

ইন্দ্রজিতের সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধে অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের রথ ধ্বংস করে দিয়েছে, তার সারথী নিহত হয়েছে। বিভীষণের মন্ত্রীর হাতে সম্পাতি এবং প্রজঙ্ঘের মৃত্যু হয়েছে। জম্বুমালীর জীবনের শেষ প্রাণবায়ুকে নিঙড়ে বের করে দিয়ে হনুমান তার দফারফা করে দিয়েছে। সুগ্রীবের হাতে মৃত্যু ঘটে প্রধসের। সর্বত্রই রাক্ষসদের পরাজয় ঘটতে থাকে।

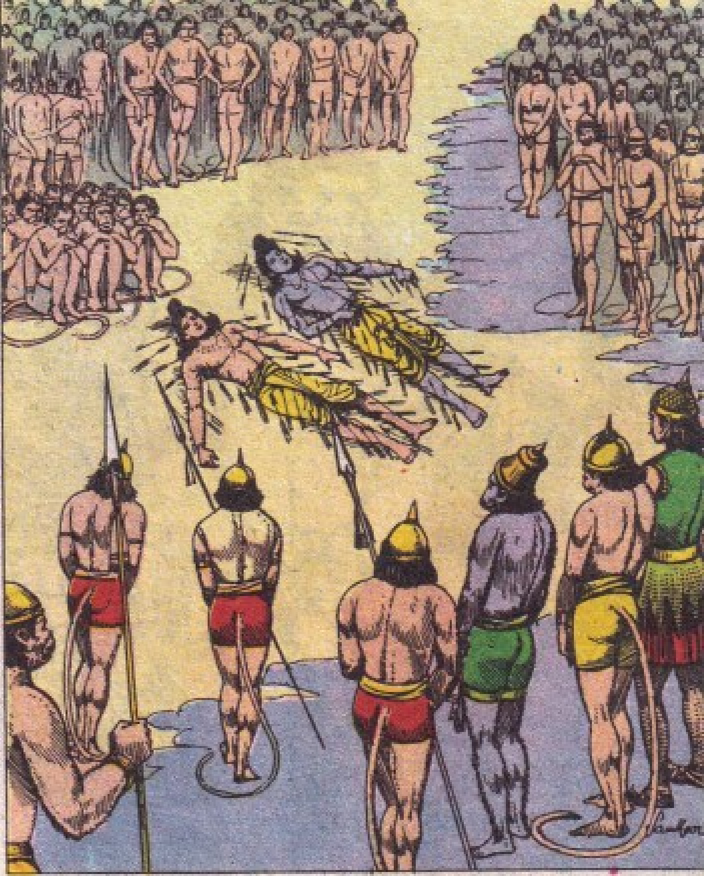
অন্যদিকে রামকেও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে দিচ্ছে না রাক্ষসেরা। তাঁকে একযোগে আক্রমণ করতে এসেছে চার রাক্ষসবীর। রাম একটি মাত্র তীর নিক্ষেপেই চারজনের শিরশ্ছেদ করলেন।

যুদ্ধ চলেছে তুমুলভাবে। কোথাও গদার সাহায্যে, কোথাও-বা কুস্তির মারপ্যাঁচ, আবার কোথাও মুষ্টিযুদ্ধ, ঘুষোঘুষি। বহু রাক্ষস মারা পড়ল, অনেক আহত হল।

সূর্যাস্ত হল। তবুও যুদ্ধ থামে না। অন্ধকারের মধ্যেই চলল অনেকক্ষণ ধরে লড়াই। রাক্ষসেরা বানর দেখলেই তাকে খেতে আসে। অন্ধকারে চিনতে না পেরে নিজেদের মধ্যেই কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে যায়। রাক্ষসদের বড় বড় দাঁত দেখে বানররা চিনতে পারে, চীৎকার চেঁচামেচি করে তাদের আক্রমণ করে, হত্যা করে। রাম ও লক্ষ্মণ অন্ধকারের মধ্যেও তীর নিক্ষেপ করে বহু রাক্ষসকে হত্যা করছেন।

অঙ্গদের হাতে রথ ও সারথিকে হারিয়ে ইন্দ্রজিৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। পরদিন সুযোগ পেয়েই ইন্দ্রজিৎ আক্রমণ করতে গেল রাম

ও লক্ষ্মণকে। কিন্তু কোনভাবেই তাদের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয় দেখে ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য হয়ে তাদের সঙ্গে লড়তে থাকে। অবশেষে ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য থেকেই তার নাগ-অস্ত্র প্রয়োগ করল। রাম ও লক্ষ্মণ দুজনে বন্দী হলেন নাগপাশে। তখন ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য অবস্থাতেই রাম ও লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করে বলল, "যখন আমি অদৃশ্য অবস্থায় যুদ্ধ করি, তখন আমি অজেয়। সে-সময়ে দেবতারাও আমার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না। এমনকি দেবরাজ ইন্দ্রও তখন আমার বিরুদ্ধে অসহায়, শক্তিহীন। তোমরা তো সাধারণ মানবমাত্র। তোমরা আমার কি করবে? এখন, তোমরাই আমার হাতে বন্দী, অসহায়ের মত পড়ে আছ। আমিই তোমাদের হত্যা করে প্রতিশোধ নেব।"



নাগ-অস্ত্রের প্রভাবে রাম ও লক্ষ্মণ অসহায় ভাবে বন্দী হয়ে আছেন। তাঁরা ইন্দ্রজিতের কথা শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। এরই মধ্যে ইন্দ্রজিৎ তাঁদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। তীরের আঘাতে দুজনেই আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। দেহের ক্ষত হতে রক্তের ধারা বেরিয়ে আসছে। রামের অবস্থা দেখে লক্ষ্মণ আরও আঘাত পেল তার মনে। ক্ষীণতম আশাও যেটুকু ছিল, তাও তার লুপ্ত হল।

রাম ও লক্ষ্মণের এরকম অবস্থা দেখে হনুমান এবং অন্য বানরবীরেরা এসে তাদের ঘিরে দাঁড়াল। অত্যন্ত ভেঙে পড়েছে তারা। ইন্দ্রজিতের সন্ধানে চারিদিকে দেখছে, কিন্তু ব্যর্থ তাদের সেই সন্ধান। একমাত্র বিভীষণই তার মায়াশক্তির প্রভাবে ইন্দ্রজিৎকে দেখতে পাচ্ছে।

ইন্দ্রজিৎ তার সঙ্গী রাক্ষসদের বলল গর্বভরে, "দেখলে, রাম ও লক্ষ্মণের এত পরাক্রম, বীরত্ব ও আস্ফালন আমার কাছে কত ক্ষুদ্র। তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। একটিমাত্র তীর প্রয়োগেই তাদের আমি বন্দী করেছি। এ এমন বন্ধন যে কেউই এ থেকে তাদের মুক্ত করতে পারবে না। এদের মৃত্যু আমার হাতেই আছে।"

ইন্দ্রজিৎ তার আস্ফালনবাক্য শুনিয়ে মায়াবলে প্রচ্ছন্ন অবস্থাতে থেকেই আরও কয়েকটা তীর নিক্ষেপ করে কয়েকজন বানরকে ধরাশায়ী করল। বীরত্ব দেখে রাক্ষসরা তার জয়ধ্বনি দিল।

অনড় অচল হয়ে রাম ও লক্ষ্মণকে



দীর্ঘসময় পড়ে থাকতে দেখে ইন্দ্রজিতের ধারণা হল, নিশ্চয়ই রাম-লক্ষ্মণের মৃত্যু হয়েছে। সে তখন রণভূমি ত্যাগ করে লঙ্কা নগর অভিমুখে রওনা দিল।

রাম ও লক্ষ্মণকে এই অবস্থায় দেখে সুগ্রীব অত্যন্ত ভীত শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তাঁদের দেহে তীরের আঘাত, মৃতবৎ পড়ে আছেন মাটির উপরে। সে কাঁদতে শুরু করল। তাকে কাঁদতে দেখে বিভীষণ তখন কাছে এসে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "সুগ্রীব, ভেঙে পড়ো না। ভয় পেয়ো না, অধীর হয়ে ওঠারও কোন কারণ নেই। রাম-লক্ষ্মণ মূৰ্ছিত হয়ে পড়েছেন। দেহের আঘাতও গুরুতর নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা জ্ঞান ফিরে পাবেন। তুমি বীর যোদ্ধা। ক্ষণিকের সামান্য ঘটনা দিয়ে সার্বিক ফলাফল বিচার করে নেওয়া তোমার উচিত নয়। ক্ষণিকের জয়ই প্রকৃত জয়লাভ নয়।" সান্ত্বনা দিয়ে সে সুগ্রীবের অশ্রু মুছে দিল সস্নেহে।

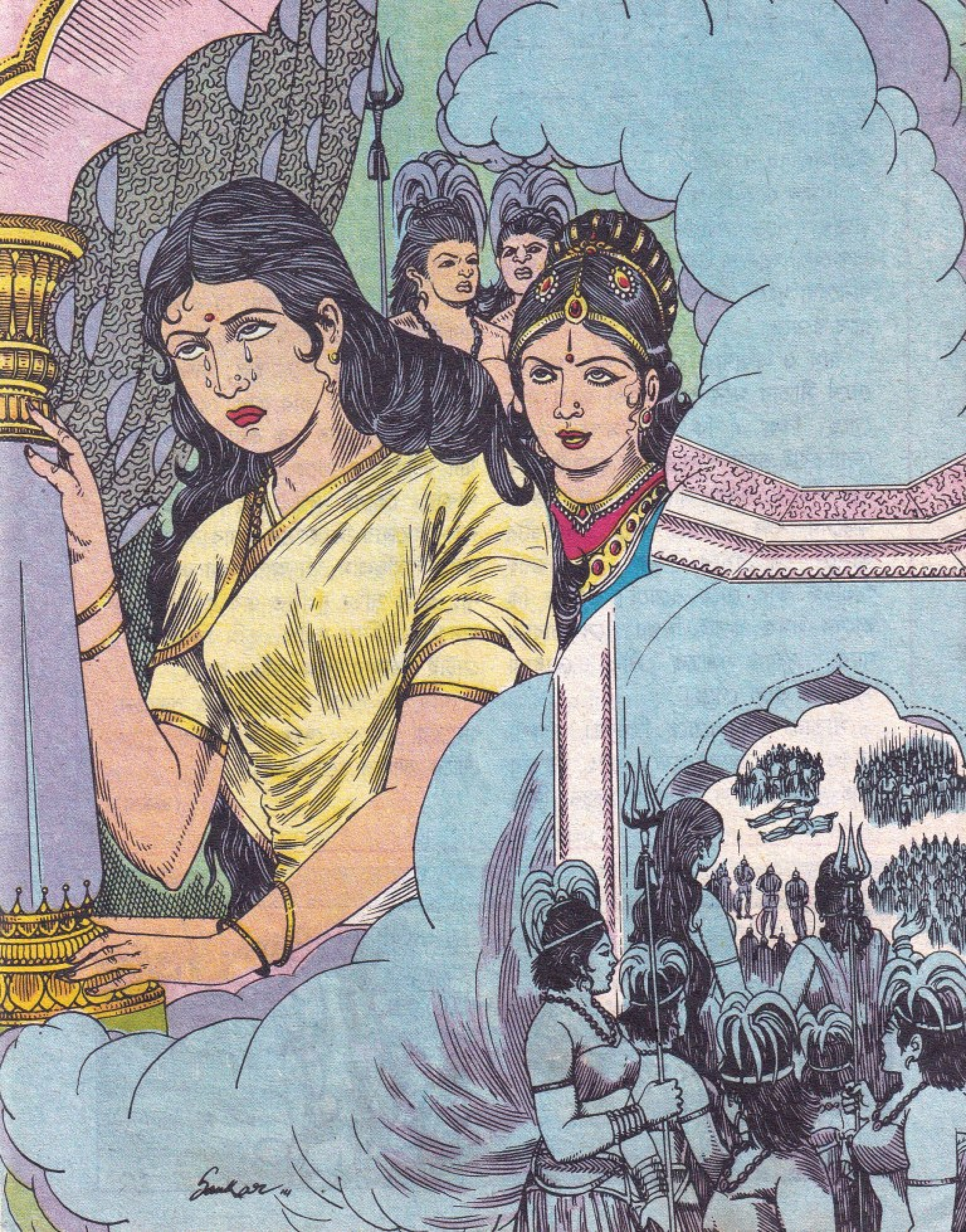
লঙ্কায় ফিরে এসে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইন্দ্রজিৎ জানাল, "আমি রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করেছি।"

সিংহাসন হতে লাফিয়ে উঠল রাবণ। পরম উল্লাসে পুত্র ইন্দ্রজিৎকে জড়িয়ে ধরল। বারবার জিজ্ঞাসা করে বীরপুত্রকে, এই অসাধ্য সাধন সে কিভাবে করল। রাবণ রাম ও লক্ষ্মণের হত্যার বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানতে চায়। ইন্দ্রজিৎ পিতাকে তারই বিবরণ দিতে থাকে, রাবণ হৃষ্টমনে তা শুনতে থাকে।

বিবরণশেষে বারবার পুত্র ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করে রাবণ তাকে বলল, সে যেন তখনই সীতার প্রহরায় নিযুক্ত রাক্ষসীদের ডেকে আনে। রাক্ষসী ত্রিজটাসহ সকল রাক্ষসীরা এলে রাবণ অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাদের জানাল, "সীতাকে গিয়ে এখনই খবর দাও যে ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করেছে। এখনই পুষ্পকবিমানে তাকে নিয়ে যাও যেখানে রাম ও লক্ষ্মণের মৃতদেহ পড়ে আছে মাটিতে। সে স্বচক্ষে দেখুক তাদের। এবার সীতার উচিত আমার কাছে আসা। যাও, এখনই যাও।"

রাক্ষসীরা এসে সংবাদটি দিল সীতাকে। পুষ্পক বিমান নিয়ে এলে ত্রিজটা সীতাকে নিয়ে ওই যানে করে রওনা দিল রাম ও লক্ষ্মণকে দেখতে।

রাবণের আদেশে তখনই লঙ্কানগরের দিকে দিকে ধ্বজা উড়িয়ে দেওয়া হল।



নগরসজ্জার কাজ শুরু হল দ্রুততালে। সর্বত্র ঘোষিত হল, রাম ও লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিৎ বধ করেছে।

বিমান হতে সীতা সবই দেখছে। রাম ও লক্ষ্মণ পড়ে আছেন ভূমির উপরে। রাক্ষসেরা আনন্দে উল্লাসে নৃত্য করছে, আর বানরেরা দুঃখে শোকে নীরব পুতুলের মত বসে রয়েছে।

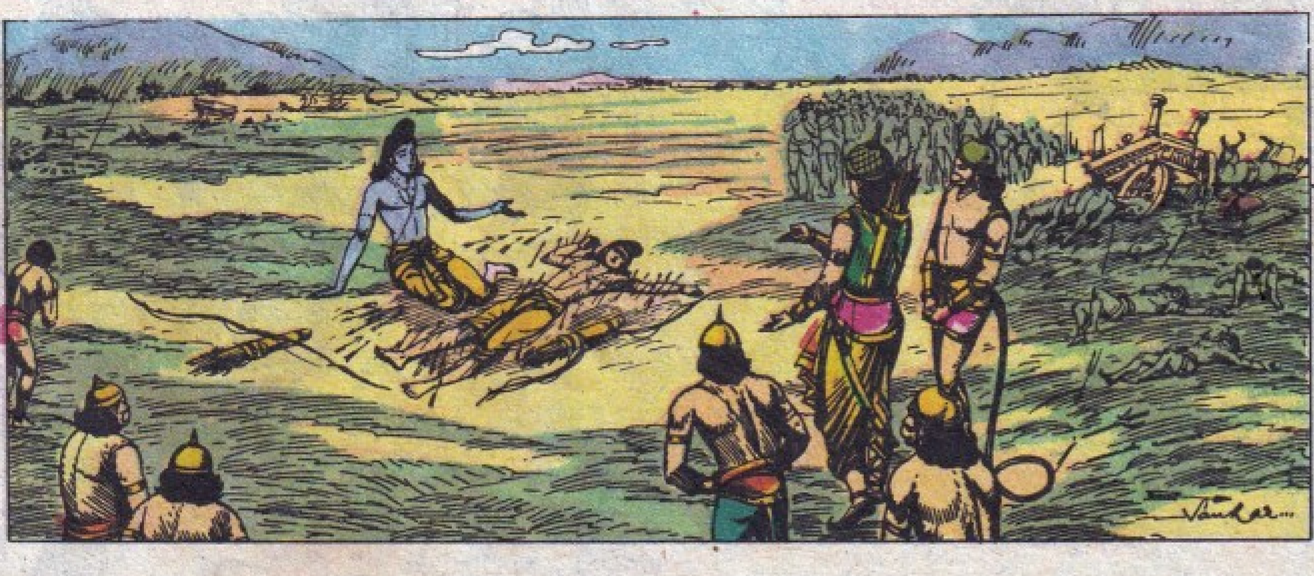
রাম ও লক্ষ্মণকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে সীতার মনে হল, সত্যি তারা মারা গেছে। কিন্তু এ কি করে সম্ভব! সকল জ্যোতিষীই তাকে বলেছে, সে পুত্রবতী হবে, তার জীবনে বৈধব্য আসবে না, তার স্বামী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করবে, সম্রাজ্ঞীর আসনে সে বসবে; কারণ এ-সমস্তরই শুভচিহ্ন তার দেহে রয়েছে। তাহলে কি তাদের সমস্ত কথাই মিথ্যা? সে ভাবতে থাকে, দুঃখে শোকে সীতা বোধহয় কাঁদতেও ভুলে গেছে।

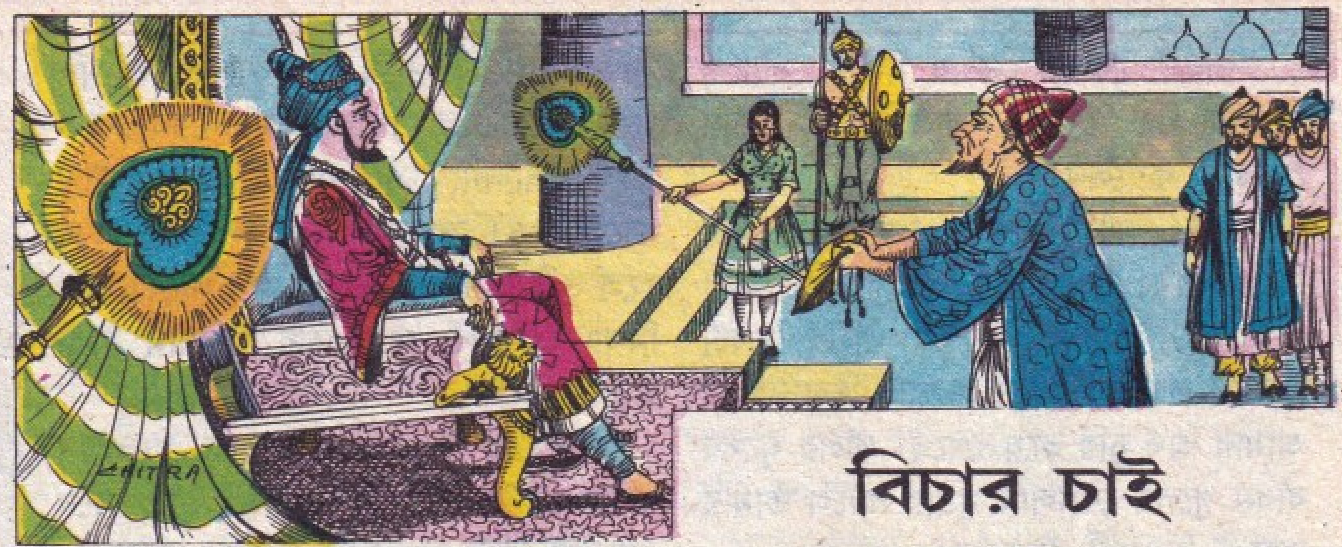
সীতার সঙ্গে রয়েছে ত্রিজটা। রাক্ষসী হলেও তার অন্তরে রয়েছে স্নেহ, সীতার প্রতি দুর্বলতা। সে সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, যেন সে দুঃখ না করে। রাম ও লক্ষ্মণ মারা যায়নি, তারা দীর্ঘসময়ের জন্য চেতনা হারিয়ে পড়ে আছে, কিছু বাদেই তাদের চেতনা ফিরে আসবে, জ্ঞান ফিরে পাবে।

দীর্ঘ সময় কেটে গেল। রামের চেতনা ফিরে এল ধীরে ধীরে। তখনও নাগপাশে বন্দী তাঁরা। লক্ষ্মণের জ্ঞান না হওয়ায় সে একইভাবে পড়ে আছে। তার দিকে চোখ ফিরতেই রামের মনে হল, লক্ষ্মণ মারা গেছে। বুক ফেটে তাঁর কান্না বেরিয়ে এল। রাম বিলাপ করতে শুরু করলেন, "লক্ষ্মণই যদি জীবিত না থাকে তবে আমার জীবিত থাকার কোন মূল্য নেই। বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যের সিংহাসনে বসাব বলে আমি কথা দিয়েছিলাম, তা আর রক্ষা করা গেল না, আমি সত্যি দুঃখিত এর জন্য। সমস্ত বানরসেনা নিয়ে সুগ্রীব, তুমি ফিরে যাও। সেটাই তোমার পক্ষে উচিত হবে।"

রাম যত দুঃখে শোকে ভেঙে পড়ছেন, বানরেরা তাঁকে দেখে ততোধিক দুঃখে শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

(ক্রমশ)





বিচার চাই

অনেককাল আগে আরবদেশে এক সুলতান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সুশাসক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম হয়েছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন কঠোর। ন্যায়ের জন্য ধনী-দরিদ্রের অধিকার ছিল সমান। রাজ্যের যেখানে যা ঘটুক, তাঁর কাছে ঠিক খবর আসত। কোন দরিদ্রের উপর অন্যায় অবিচার হলে সে ছুটে আসত সুলতানের কাছে সুবিচারের আশায়, এবং যতক্ষণ-না তার নিষ্পত্তি হ'ত, ততক্ষণ সুলতান শান্তি পেতেন না।

একদিন সুলতান দরবারে বসে আছেন। এমন সময়ে একজন লোক সেখানে এসে উপস্থিত হল। বিবর্ণ চেহারা। হাতে একটা থলি। তাকে দেখে সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, "মনে হচ্ছে তোমার কিছু হয়েছে। কি ব্যাপার?"

"জাঁহাপনা, আমি একজন সামান্য ব্যবসায়ী। আপনার নিযুক্ত লোক অন্যায় ভাবে আমাকে ঠকিয়েছে।" আগন্তুক বলল।

"বল, কি হয়েছে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব বিচার করে তোমার প্রাপ্য তার কাছ থেকে আদায় করে দিতে।" সুলতান তাকে আশ্বাস দিলেন। সুলতানের কাছে আশ্বাস পেয়ে ব্যবসায়ী তার সব ঘটনা বলল:

ব্যবসায়ী কোন এক দূর গ্রামে যাচ্ছিল। ব্যবসা-অর্জিত দুই হাজার মুদ্রা সে তার থলির মধ্যেই রেখেছিল। বহু পরিশ্রমের উপার্জন। পথে চোর-ডাকাতদের ভয় আছে। তাই সে একে নিরাপদে রক্ষা করার জন্য থলিতে রেখে, থলির মুখ ভাল করে বন্ধ করে শহরের কাজীর কাছে রেখে গিয়েছিল। কাজের শেষে কয়েকদিন পরে ফেরার সময় কাজীর কাছ হতে সে তার থলি নিয়ে যায়। কিন্তু হায়! থলির ভিতরে স্বর্ণমুদ্রা নেই, তার পরিবর্তে আছে কিছু তামার পাত। ব্যবসায়ী নিশ্চিত যে, এ কাজ কাজী করেছেন।

(আরবদেশের উপকথা)

"থলিটা ফেরত নেবার সময়ে সেটাকে আগের মত দেখতে পাওনি?" সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন।

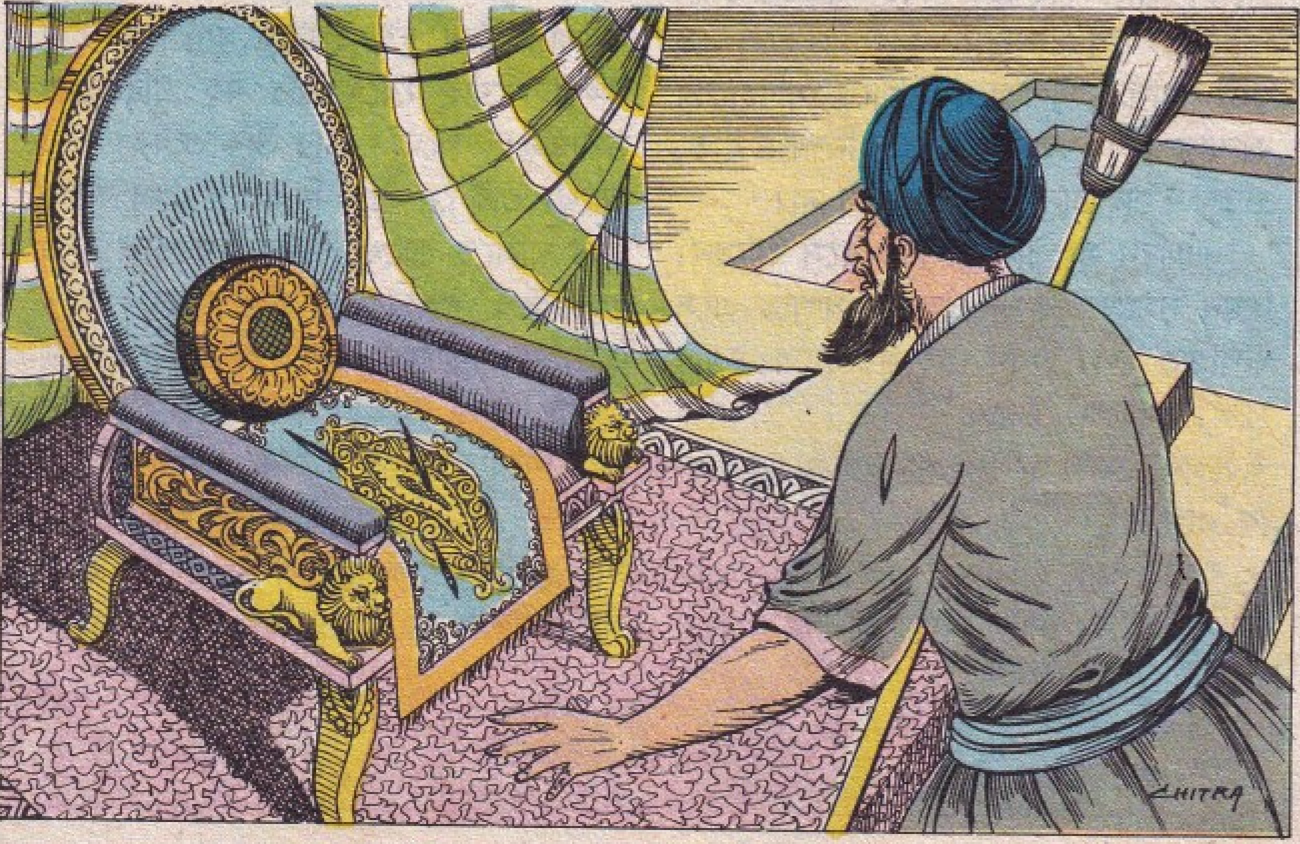
"প্রভু, আমি যেরকম অবস্থায় থলিটা দিয়েছিলাম, সেটা ঠিক সেইরকমই ছিল। বাড়ীতে গিয়ে যতক্ষণ-না থলির মুখটা খুলেছি ততক্ষণ কোন ধারণাই ছিল না যে আমার অর্থ চুরি হয়ে গেছে। থলির মুখের বাঁধন খুলেই দেখলাম মুদ্রার বদলে তামার পাত।" ব্যবসায়ী সুলতানকে জানাল।

"ঠিকভাবে তুমি দেখেছিলে যে থলির মধ্যে কোন কাটার বা ফেটে যাওয়ার দাগ ছিল না।" সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন।

"কিছু ছিল না। থলিটা ঠিক যেমন দিয়েছিলাম তেমনই ছিল। এরজন্যই আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি। আমি নিশ্চিন্তে বাড়ী নিয়ে গেছি।" সওদাগর বলল।

সওদাগরের উত্তর শুনে সুলতানের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। কিছুটা সময় নীরব থেকে তিনি বললেন, "এই থলিটা তুমি এখানে রেখে যাও। আমাকে যা বলেছ তা সত্য হলে তুমি নিশ্চয়ই তোমার অর্থ পাবে। আর মিথ্যা প্রমাণিত হলে তার পরিণাম কিন্তু মৃত্যু।"

দরবারের কাজ শেষ হলে সুলতান অন্তঃপুরে চলে যান। কিন্তু তাঁর মনে কেবলই চিন্তা ব্যবসায়ীর নালিশ সম্পর্কে। কি করে এটা সম্ভব হল? থলি যেমন ছিল ঠিক তেমনই অক্ষত, বাঁধা, অথচ ভিতরের মুদ্রাগুলি চলে গেল। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর মাথায় যেন একটা চিন্তা খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সুলতান দরবারে চলে এলেন। কেউ সেখানে নেই। একটা ছুরি দিয়ে সিংহাসনের উপরে মোড়া মূল্যবান ঢাকনাটি



কিছুটা কেটে দিলেন। ফিরে এলেন নিজের কক্ষে।

পরের দিন সকালে সুলতান ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লেন শিকারের জন্য। সুলতান চলে যাবার পরেই লোক এল দরবার কক্ষ সাফাই করতে। সাফাই করতে করতে নজরে পড়ল সিংহাসনের ঢাকনার কাপড়টি কাটা। সে ঘাবড়ে গেল। তখনই না বললে হয়তো তাকেই এর জন্য দায়ী হতে হবে। তখনই প্রাসাদের অধিকর্তাকে ডেকে এনে দেখাল। এখন উপায়?

প্রাসাদ-অধিকর্তা কাটা জায়গাটি দেখে সাফাইওয়ালাকে বলল, "চিন্তার কিছু নেই। এখনই এটাকে ঠিক করে দেওয়া যাবে। শহরের বিখ্যাত দর্জি মহম্মদকে ডেকে নিয়ে এস। সে কাটা জায়গাটা এত সুন্দর করে সেলাই করে দেবে যে বোঝাই যাবে না।"

সাফাইওয়ালা ছুটে গেল মহম্মদ দর্জির কাছে। তাকে সব জানিয়ে বলল, সুলতান যদি জানতে পারে তাহলে তার গর্দানটাই আগে নেবে।

"না, না, তোমার মুণ্ডটা যাবে না। ভয় পেও না তুমি। এমন করে রিপু করে দেব যে কেউ সেটা ধরতে পারবে না। তবে আমাকে কিন্তু দুটি মুদ্রা দিতে হবে।" দর্জি আর্জি জানাল।

সাফাইওয়ালা তার মুণ্ড বাঁচাবার জন্য তাতেই রাজী হল। মহম্মদ দর্জি দরবারে এসে রাজ-সিংহাসনের ঢাকনা এত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে রিপু করল যে তা বোঝাই যাচ্ছে না। অতুলনীয় তার হাতের কাজ। হাসি ফুটল সাফাইওয়ালা এবং অধিকারীর মুখে।

ঠিক সূর্যাস্তের সময় সুলতান ফিরে এলেন শিকার থেকে। ঘোড়া হতে নেমে



তিনি সোজা চলে এলেন দরবারে সিংহাসনের সামনে। তিনি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। কাটার কোন চিহ্ন নেই। সুলতান এরকমই আন্দাজ করেছিলেন। ডেকে পাঠালেন সাফাই-ওয়ালাকে। সে এলে জিজ্ঞাসা করলেন সুলতান, "সকালে সিংহাসনের এই ঢাকনাটা তুমি কাটা দেখেছিলে, তাই না?"

সাফাইওয়ালা ভয়ে বলে দিল যে, কোন কাটা ছিল না। তার মিথ্যা উত্তর শুনেই সুলতান চেঁচিয়ে উঠলেন, "বদমাশ্, আমার কাছেও মিথ্যা! আমি নিজে গতকাল রাতে কেটেছি। সত্যি বল্, এইটাকে কে এত সুন্দর করে রিপু করে দিয়েছে।" সাফাই-ওয়ালা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সমস্ত বলল।

সাফাইওয়ালার মুখে মহম্মদের নাম শুনে সুলতান তাকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে তাকে থলিটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা পূর্বে কোনও সময়ে দেখেছিলে?"

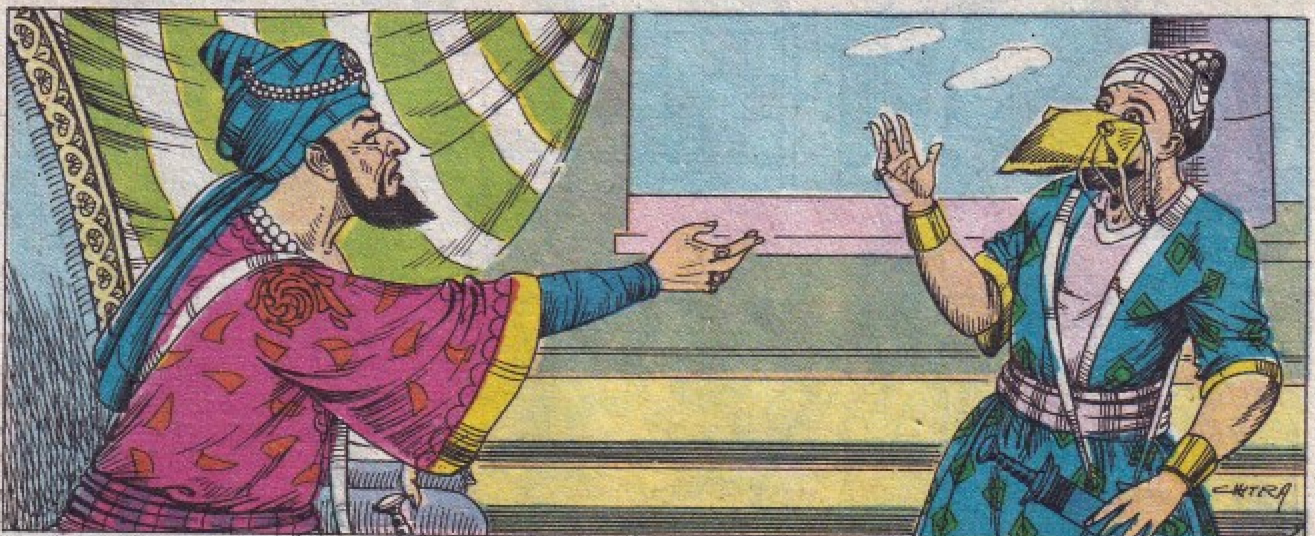
থলিটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখে মহম্মদ বলল, "হ্যাঁ, হুজুর। শহরের কাজী আমাকে দিয়ে এটি সেলাই করিয়েছিল।"

তখনই ডেকে পাঠালেন কাজীকে। কাজী আসামাত্র সুলতান রাগে ফেটে পড়লেন, "নির্লজ্জের মত কাজ করে কি পার পাওয়া যায়? তোমার এরকম কাজের সাথে সাথে আমার ও রাজ্যের সম্মান, দুইই মাটিতে মিশে যাচ্ছে সে খেয়াল আছে?"

"হুজুর, আমি সেরকম কোন কাজ তো করিনি। হয়তো আমার কোন শত্রু আমার সম্বন্ধে আপনার কাছে মিথ্যা নালিশ জানিয়েছে।" কাজী জবাব দিল।

"তোমার জিব আমি কেটে দেব। কি এটা?" বলে থলিটা ছুঁড়ে মারলেন কাজীর মুখের উপর। কাজীর মনে পড়ল ঘটনা। সুলতানের পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইল।

কাজীকে ক্ষমা করলেন না, সুলতান তাকে জেলখানায় পুরে দিলেন। আর ব্যবসায়ীকে ডেকে দুই হাজার মুদ্রার সাথে আরো তিন হাজার মুদ্রা উপহারস্বরূপ দিয়ে বললেন, "উঁচুপদে অধিষ্ঠিত একজন চোরকে ধরিয়ে দিয়ে তুমি দেশের অনেক উপকার করেছ। এর জন্যই পুরস্কার।"





বন্ধ কর

সরস্বতীকে গ্রামের সকলেই চেনে। এমন ঝগড়াটে সে যে তার নাম শুনলেই লোকে পালায়। পাশেই তার ননদ সুনীতার বাড়ী। দিনরাত সুনীতার সাথে ছোটখাট সামান্য ব্যাপারটাকেই বড় করে তুলে ঝগড়া বাঁধাতে চায়। সবসময় খিচ্‌খিচ্‌ করেই চলেছে। তার জিবের এত ধার যে ভয়ে কেউ কথা বলে না। সুনীতা চুপ করে সব শুনে যায়। সরস্বতীর স্বামী শীতলদেবও চুপ করে থাকে। সে জানে, কিছু বলতে গেলে তাতে ঝগড়া বাড়বে, বিন্দুমাত্রও কমবে না। কারো স্বভাব পরিবর্তন করা যায় না সে নিজে না করলে। লোকে ভাবে, এ যে কি সরস্বতী, কে জানে।

একদিন ভোরবেলায় সুনীতার পোষা বিড়ালটা সরস্বতীর রান্নাঘরে রাখা একবাটি দুধ খেয়ে পালিয়েছে। সরস্বতী শুরু করল তীব্রভাষায় গালাগাল দিতে। তার ভাষায় ছোট্ট একবাটি দুধ পরিণত হল এক গামলা দুধে। গালাগাল, সেই সঙ্গে শাপশাপান্ত করা। সুনীতাও নিত্যদিনের মত মুখ বুজেই ছিল। কিন্তু আর পারল না যখন বিড়ালটাকেও শাপশাপান্ত করতে লাগল।

সুনীতা এবারে জবাব দিল, "আমার বিড়ালটা তোমার একবাটি দুধ খেয়ে নিয়েছে, আমি তোমায় দশবাটি দুধ দেব। বিড়ালটাকে আর গালাগাল দিও না।"

এতক্ষণ একতরফা ভাবে সরস্বতী চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, এবার তার সুবিধা হল। "দুধের জন্য আমি যেন মরে যাচ্ছি। ওই রাক্ষস বেড়ালটাকে গ্রামের বাইরের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। তাহলেই আমার মুখ বন্ধ হবে।"

"কখনই তা হবে না, তোমার আশা দুরাশা মাত্র।" সুনীতা জবাব দিল।

সরস্বতীর মুখ আরও খুলে গেল। মাঝে মাঝে সুনীতার উত্তর। ঝগড়া চরমে উঠল।

শীতলদেব ক্ষেতের কাজে যাবার জন্য

স্বপন মিত্র



নাম সরস্বতী না।" তুমি থেকে তুই-এ নেমে এল সরস্বতীর সম্বোধন।

"আমি এমন কিছু নতুন কথা বলিনি যে আমাকে সকলের সামনে মাথা নীচু করতে হবে। যা সত্য তাই বলেছি।" সুনীতা জবাব দিল।

"ঠিক আছে", বলেই সরস্বতী বাড়ী থেকে বেরিয়ে সোজা এল মোড়লের কাছে। সবিস্তারে জানিয়ে সে মোড়লকে বলল, যেন সুনীতাকে ডেকে খুব করে ধমক দেয় এবং তার কাছে ক্ষমা চাওয়ায়।

গ্রামের মোড়ল সরস্বতী এবং সুনীতাকে ভালভাবেই জানে। সে একটু ভেবে বলল, "কোথায় সে? যখন ঘটনাটা হয়েছে, তখন ওখানে কেউ ছিল কি? যে স্বচক্ষে দেখেছে, স্বকর্ণে শুনেছে, তাকেই চাই।"

"আমার ছোটভাই রামরাজ এবং ছোটদেবর রাজশেখর তখন ওখানে ছিল।" সরস্বতী জানাল।

মোড়লের কথায় সরস্বতী ছুটল ঐ দুজনকে ধরে আনতে। মোড়ল তার লোক পাঠিয়ে সুনীতাকে ডেকে আনাল। দুই-একটা কথা বলল তার সঙ্গে।

সকলে উপস্থিত হলে মোড়ল সর্বপ্রথমে সরস্বতীর ছোটভাই রামরাজকে ডেকে বলল, "যখন সুনীতা তোমার জামাইবাবুকে 'বউয়ের গোলাম' বলেছে, তুমি কি তা শুনেছিলে?"

"হ্যাঁ, আমি শুনেছি। আমার জামাই-বাবুকে যখন ও-কথা বলছিল তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার জামাইবাবু বেশ শক্তসমর্থ লোক। কিছুদিন আগে একটা

তৈরী হচ্ছিল, সে তার বোনকেই ধমক দিয়ে থামাবার চেষ্টা করল, "সকাল থেকেই কি শুরু হয়েছে, তুই কি থামবি?"

সুনীতার অত্যন্ত রাগ হল। সে দাদাকেই বলে দিল, "খুব তো এগিয়ে এসে আমায় ধমক দিচ্ছ। নিজের বউয়ের মুখ বন্ধ কর, তাহলেই হবে। বউয়ের কাছে তো জুজু; বউয়ের গোলাম হয়ে থাক।"

শীতলদেবের মুখ থেকে আর একটাও আওয়াজ বেরল না। চুপচাপ সে তার কাজে বেরিয়ে গেল।

সুনীতার কথায় সরস্বতী গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলল, "নিজের বড় ভাইকে পর্যন্ত সম্মান দিস না, এত বড় অহঙ্কারী হয়ে উঠেছিস। গ্রামের সকলের সামনে তোকে দিয়ে যদি আমার পা না ধরাই, তবে আমার

চোর সিঁদ কেটে ঢুকলে জামাইবাবু একাই তাকে ধরে খুব মারে। গ্রামের সকলেই জানে, ঋণ আদায়ের সময় জামাইবাবু কত কড়া কথা বলে। তা সত্ত্বেও কি 'ভয়ে জুজু' বা 'বউয়ের গোলাম' তাকে বলা যায়?" রামরাজই জিজ্ঞাসা করল মোড়লকে।

রামরাজের কথা শুনে মোড়লের মুখে হাসি খেলে গেল। তারপর সে রাজশেখরকে বলতে বলল, সে যা জানে।

"আমার দাদা যখন ক্ষেতে কাজ করতে যায়, তখন দিনমজুররা ভয়ে কাজ শুরু করে দেয়, দাদার ভয়ে একটুও ফাঁকি দেয় না। দাদাকে কিছুই বলতে হয় না। তবুও কি আমার দাদাকে দিদির কথামত 'ভয়ে জুজু' বলা যায়, নাকি 'বউয়ের গোলাম' বলা যায়?" রাজশেখর জানতে চাইল।

এদের দুজনের সব কথা শুনে মোড়ল সুনীতাকে বলল, "সবই তো তুমি শুনলে। তোমার দাদা শীতলদেবকে কি এরকম অপমানজনক কথা বলে অসম্মান করাটা ঠিক হয়েছে?"

সুনীতা একটুও ভয় পেল না। সে বলল, "আমিও ভালভাবে জানি যে আমার দাদা খুব শক্তসমর্থ। ঋণ আদায় করতে বা দিনমজুরদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে। কিন্তু দাদা এসব তখনই পারে যখন আমার বউদি তার সামনে থাকে না।"

সুনীতার কথায় সকলেই হেসে ফেলল। মোড়লও হেসে বলল, "তার মানে তুমি যা বলেছ সেটা বিশেষ অর্থেই বলেছ। সে-ব্যাপারে আমার তো কিছুই বলার নেই।"

উপস্থিত আর সকলকে বিদায় জানিয়ে মোড়ল সরস্বতী ও সুনীতাকে পৃথকভাবে তাদের বুঝিয়ে বলল, "লোকেরা তোমাদের দেখে কেমন হাসছে দেখ। নিজেরা একটু সংযত হও, তোমাদের ভুলত্রুটি বুঝে নিজেরাই সেটা শুধরে নাও। এটাই সবথেকে ভাল।" অবশ্য সরস্বতীকে একটু বেশি বলল, "ঝগড়া করা তোমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মনে হয়, সকলেই ভুল করছে, কেবল তুমিই ঠিক। এই মনোভাবের জন্যই ঝগড়া হয়। চেষ্টা কর, দেখবে স্বভাবে পরিবর্তন এলে ঝগড়াও বন্ধ হবে। যাও, আর যেন ঝগড়া কানে না আসে।"





যাচাই করা

সুদীপ আর প্রদীপ দুই বন্ধু। একই গ্রামে তাদের বাস। দুজনেই খুব গরীব। এদিক-সেদিক ঘুরে দিনমজুর খেটে সেই উপার্জনে কোনরকমে চলে। যেদিন কাজ থাকে না, সেদিন বোধহয় খাওয়াও জোটে না। সেজন্য দুজনেই খুব চেষ্টায় ছিল, যদি একটা বাঁধাধরা কাজ পেয়ে যায়। এখানে ওখানে সন্ধান করে বেড়ায় কাজের জন্য।

হঠাৎ তাদের কানে একটা খবর এল, পাশের গ্রামের জমিদার কাজের জন্য লোক খুঁজছেন। ওখানে গেলে কাজ পাওয়া যেতে পারে।

খবরটা শুনেই পরের দিন তারা সকালবেলা রওনা দিল পাশের গ্রামে। জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য তার বাড়ীতে এলে চাকর তাদের অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে গিয়ে জমিদারকে খবরটা দিল যে, দুজন লোক কাজের জন্য এসেছে। জমিদার তাদের একবার দেখলও না, কোন কথাও বলল না, একবার কাছে ডেকেও পাঠাল না। চাকরকে কেবল বলল, সে যেন ওই দুজনকে পরের সোমবার খুব সকালে চলে আসতে বলে। চাকর এসে সেরকমই বলল।

দুই বন্ধুতে ফিরে চলল। চলতে চলতে সুদীপ বলল, "যা বলার ছিল তা আজ বলে দিলেই হ'ত। এর জন্য আবার সোমবার আসতে হবে।"

সোমবার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই প্রদীপ যাবার জন্য তৈরী হয়ে বন্ধুর বাড়ী এল। এসে দেখে তখনও সুদীপ খুব ঘুমাচ্ছে। তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে প্রদীপ বলল, "কিরে, জমিদারের বাড়ীতে যাবি না? চল তাড়াতাড়ি।"

সুদীপ না উঠেই বলল, "সকাল সকাল গিয়ে কি হবে। পরে গেলেও চলবে।" বলে সে আবার ঘুম দিল।

"আমি কিন্তু যাচ্ছি। যদি যেতে হয়

(২৫ বৎসর পূর্বে চাঁদমামায় প্রকাশিত)

আয়।" বলেই প্রদীপ রওনা দিল হনহনিয়ে। তার মাথায় রয়েছে, জমিদার যখন সকাল সকাল যেতে বলেছেন, তখন বেলায় যাওয়া মোটেই ঠিক হবে না।

প্রদীপ চলে যাবার পর আরো এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে সুদীপ উঠে রওনা দিল জমিদার-বাড়ীর জন্য। সে নিশ্চিত যে, আজও জমিদারের দেখা পাবে না, কোন কাজও হবে না। ধীরে সুস্থে সে চলল।

জমিদারবাড়ীতে প্রদীপ এসে পৌঁছানমাত্র জমিদারের লোক ভিতরে তার আসবার সংবাদ জানাল। জমিদার শুনেই বলল, "কিন্তু আরেকজন আসেনি কেন? যাও, জিজ্ঞাসা করে জেনে এস।"

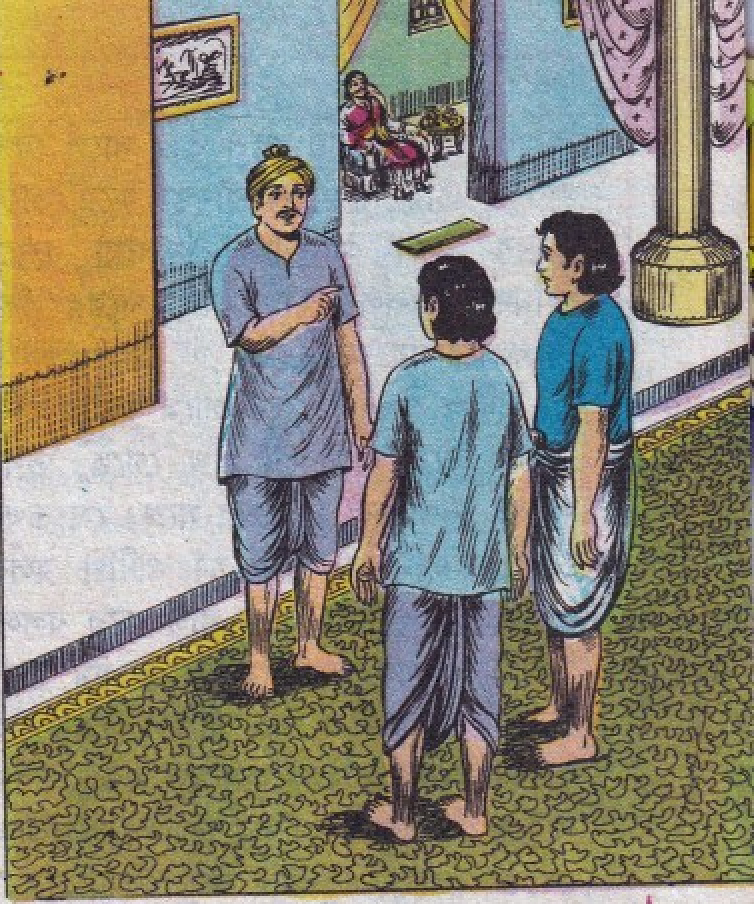
"ও একটু পরেই আসছে, যে এসেছে সে বলল।" জমিদারের লোকটি প্রদীপের কাছে জেনে জমিদারকে বলল।

"ঠিক আছে, ওকে একটু অপেক্ষা করতে বল।" জমিদার নির্দেশ দিল।

প্রদীপ অপেক্ষা করে আছে। অনেকক্ষণ পরে সুদীপ এল সেখানে। প্রদীপকে দেখেই বলল, "আমি বলেছিলাম না, সকালে এসে কি হবে। আমার থেকে আগে এসে কি পেলি তুই, বল্। আর দেরীতে এসে আমারই-বা কি হল? দুই-ই সমান।"

ইতিমধ্যে জমিদারের কাছে খবর চলে গেছে যে আরেকজনও এসে গেছে। কিছু সময় পরে জমিদারবাবু নিজে এসে তাদের বলল, "কাজের জন্য তোমরা দুজনেই এসেছ? খুব ভাল। আজ তোমরা যাও, কিন্তু আগামী বুধবার সকালে চলে আসবে।"

দুই বন্ধুতে পথ চলেছে, নিজেদের



গ্রামের দিকে। হাঁটতে হাঁটতেই সুদীপ বলে উঠল, "জমিদার শুধুশুধুই আমাদের ঘোরাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখানে বারবার আসাটাই মাঠে মারা যাবে।"

"দেখ, আমাদের কোন কাজ নেই, বেকার। জমিদার আমাদের কাজ দেবে, সুতরাং সে যতবারই আসতে বলুক না কেন, আমাদের আসতে হবে। মাথা গরম করলে কোন লাভ হবে না।" প্রদীপ সুদীপকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

বুধবার যথারীতি প্রদীপ একাই সকালবেলা রওনা দিল। যেসময়ে জমিদার আসতে বলেছিল সে-সময়েই সে এসে হাজির হল জমিদারবাড়ীতে। ভিতরে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রদীপ অপেক্ষা করে আছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা

করার পর জমিদার এসে তার সাথে দেখা করল। তার খাবারের ব্যবস্থা করে তাকে আদর করে খাওয়াল। খাওয়া শেষে জমিদার বলল, সে যেন পরের দিন বিকেলবেলায় আসে।

প্রদীপ যখন নিজের গ্রামে যাবার জন্য রওনা দিয়ে অনেকটা পথ গেছে, তখন পথেই দেখা হল সুদীপের সঙ্গে। সে তখন চলেছে জমিদার বাড়ীতে। প্রদীপ বলল তাকে সব। সুদীপ শুনে ব্যঙ্গ করে বলল, "আমি আগেই জানতাম যে এরকম হবে। যেরকম ভিক্ষুকের মত যাচ্ছিস, সেরকমই ব্যবহার করছে। ভিক্ষুকের মত একটু খাবার খাইয়ে দিয়েছে। আবার কালও বিকেলে যেতে বলেছে, এরকমই কিছু একটা হবে।"

"যখন বলেছে কাল বিকেলে যেতে, তখন আমাকে যেতে হবেই। তোকেও তো বলেছে, তুই ঠিক সময়ে যাচ্ছিস কোথায়! আমাদের দরকার, সুতরাং কথা তো মানতেই হবে।" প্রদীপ বলল সুদীপকে।

"বেশ, তোর কথামত কাল বিকেলে আমি যাব, কিন্তু এই শেষ।" সুদীপ জানাল।

পরের দিন বিকেলে দুজনে জমিদারের বাড়ীতে এসে পৌঁছলে জমিদারের লোক এসে বলল যে, জমিদারবাবু বলেছে কাল সকালে কথা হবে।

সুদীপের অত্যন্ত রাগ হল। সে জমিদারের লোককে বলল, "কাজ যদি দিতে না চান, তাহলে বলে দিলেই হয়।" তারপর প্রদীপকে বলল, "চল, বাড়ী ফিরে যাই।" বলেই সে রওনা দিল বাড়ীর দিকে।

পরদিন সকালে জমিদার প্রদীপকে সঙ্গে দেখা করে বলল, "তোমাকেই আমি কাজে নিচ্ছি। এবং গত সোমবার থেকেই তুমি কাজ করছ বলে ধরে নেবে। তোমার খাওয়া-পরা, থাকা বাদেও বেতন পাবে একশ টাকা। আশেপাশের গ্রামের চাষীদের কাছে টাকা আদায়ের কাজেই তোমাকে যেতে হবে। পারবে কিনা, সেটাই দেখে নিলাম এই কদিনে। যদি ভাল কাজ কর, তবে বেতন আরও বাড়বে।"

প্রদীপের কাজ পাকা হয়ে গেল শুনে সুদীপের মাথায় হাত, নিজের দোষের জন্যই সে মস্ত সুযোগটা হারাল।





ধার করা রঙের বাহার

ফ্লেমিংগো পাখীর দেহের এবং ঠোঁটের গোলাপী রঙ দেখতে ভালই লাগে। কিন্তু ওই রঙকে যদি তার স্বাভাবিক রঙ বলে মনে করা হয় তাহলে ভুল হবে। সকলেরই জানা যে এই পাখীদের প্রধান খাদ্য নীলচে-সবুজ রঙের সামুদ্রিক শৈবাল যা জীর্ণ হবার সময়ে গোলাপী রঙে পরিবর্তিত হয়ে যায়। বলা যায় যে, এই পাখীরা তাদের খাদ্য থেকেই দেহের রঙ পায়। তাই, নিত্য যদি একটা করে টমেটো খাওয়া যায়, নিশ্চয়ই গালের রঙটা...চেষ্টা করলে ক্ষতি কি।

প্রাকৃতিক বিস্ময়

জিরাফের সম্বন্ধে

৪-৫ ইঞ্চি লম্বা একটা ইঁদুরের মেরুদণ্ডে সাতটি অস্থিসন্ধি আছে। জিরাফের গলা প্রায় ৭ ফুট লম্বা, তাহলে এর অস্থিসন্ধির সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক বেশি। সেটা ভুল ধারণা। এরও আছে সাতটি অস্থিসন্ধি। আশ্চর্য নয় কি? জিরাফের জিব ১৮ ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু আমাদের ৩ ইঞ্চির বেশি নয়। জিরাফ একটা ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত দৌড়তে পারে; অবশ্য ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া নয়। জিরাফ যখন দৌড়ায় তখন কোন শব্দের সৃষ্টি হয় না।





এখনও দাঁড়িয়ে

'কনস্টেবল ট্রি' নামে কোন গাছ সম্বন্ধে শোনা যায় কি? আসলে এটা একটা কমলালেবুর গাছ যেটা ১৫ শতকের প্রারম্ভে ফ্রান্সে আনা হয়েছিল। ৪৭০ বৎসর ধরে গাছটি বেঁচে আছে এবং যথারীতি ফল ধারণ করে চলেছে। একটা কমলালেবু গাছের আয়ু সাধারণত হয় একশ বছর।



Don't you owe the
See my tail It's out of a Fairy Tale
Nice 'n' funny I'm a Bunny
Foxy is my name But I'm oh-so tame
Your Bear Hugs are warmer than mine
Tonight y
Tomorr


little one a cuddles?
I can't chase no mice But I'm soft 'n' nice
Give the Li'l Panda a Handa
No carrots to eat But I'm a treat
u hug me tight w I'll give you a ride
The CHANDAMAMA Collection of Soft Toys
CHANDAMAMA TOYTRONIX

ফোটো-নামকরণ প্রতিযোগিতা : পুরস্কার 100 টাকা

পুরস্কৃত নাম অগাস্ট ১৯৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে



M. Natarajan



M. Natarajan

● দুটো ফোটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই এবং নামকরণটি দু-চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই। ● দুটো ফোটোর নামকরণ শুধুমাত্র পোস্টকার্ডেই লিখে নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে. ● ২০ জুন '৯২-এর মধ্যে এই কার্ড পৌঁছান চাই। ● চাঁদমামার যে-কোন পাঠক-পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন তবে প্রতিযোগীকেই পোস্টকার্ডটি লিখতে হবে নিজের বয়স উল্লেখ করে। ● জয়ী প্রতিযোগীকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

Chandamama Photo Caption Competition (Bengali),
Chandamama Buildings, Vadapalani, Madras 600026

এপ্রিল '৯২ ফোটো-নামকরণ প্রতিযোগিতার ফল

প্রথম ফোটোর নাম : চলছে ওরা পাথুরে পথে
দ্বিতীয় ফোটোর নাম : বাইছে দাঁড় নিয়ে হাতে
পুরস্কার পেয়েছেন : ছন্দসী নস্কর, c/o, শ্রীসন্ন্যাসীচরণ নস্কর, গ্রাম: থানামাকুয়া, পোঃ দানেশ শেখ লেন, হাওড়া-৯

[পুরস্কারের টাকা এই মাসের মধ্যেই পাঠানো হবে]

Printed by B.V. REDDI at Prasad Process Private Ltd., 188 N.S.K. Salai, Madras 600 026 (India) and Published by B. VISHWANATHA REDDI on behalf of CHANDAMAMA PUBLICATIONS, Chandamama Buildings, Vadapalani, Madras 600 026 (India). Controlling Editor: NAGI REDDI.